মুক্তিযুদ্ধে ছাত্রলীগ ও বাংলাদেশ লিবারেশন ফোর্স (বি.এল.এফ.)

শেখ মোহাম্মদ জাহিদ হোসেন

মুক্তিযুদ্ধে ছাত্রলীগ
ও
বাংলাদেশ লিবারেশন ফোর্স
(বি.এল.এফ.)

শেখ মোহাম্মদ জাহিদ হোসেন

অঙ্কুর প্রকাশনী

উৎসর্গ

আমার বাবা মরহুম শেখ আবদুল ওদুদ

ও

মা বেগম লুৎফন্নেসাকে

যাদের প্রেরণায় আমরা দুই ভাই
এক সময়ে গণ-মানুষের সংগ্রামে সামিল হয়েছি

ভূমিকা

আমি ইতিহাসবিদ নই এবং লেখকও নই। তবু ইতিহাসের এক মহা-শুভলগ্নে (১৯৬৯-'৭১) একজন একনিষ্ঠ রাজনৈতিক কর্মী হিসেবে আমার এবং আমার সহ-কর্মীদের ভূমিকা এবং জানা ঘটনাসমূহ ভবিষ্যত প্রজন্মকে জানানো দায়িত্ব ও কর্তব্য বলে আমি মনে করি। একান্তভাবেই নিজের রাজনৈতিক গন্ডিতে থেকে যে-ভাবে সেদিনের অগ্নিঝরা দিনগুলোর ঘটনা দেখেছি, শুনেছি এবং জেনেছি সেভাবেই লিখেছি। এতে হয়তো সেদিনের সেই বিশাল কর্মকান্ডে আমার জানার বাইরে ঘটে যাওয়া অনেক কিছুরই বর্ণনা দেওয়া সম্ভব হয়নি। এছাড়াও নিজের একটি রাজনৈতিক দলের এবং মতাদর্শের সঙ্গে সরাসরি সম্পৃক্ততার কারণে অনেক ঘটনার বর্ণনা বা ব্যাখ্যা নিজের মতো করে দিয়েছি, এতে অনেক ক্ষেত্রে হয়তো ঘটনার নিরপেক্ষতা বা বস্তুনিষ্ঠতা ক্ষুণ্ন হয়ে থাকতে পারে। সেজন্যে সংশ্লিষ্ট সকলের কাছে আমি প্রথমেই ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি।

যে লাখো-লাখো ছাত্র-শ্রমিক-কৃষক-জনতা তাঁদের শ্রম ও রক্ত দিয়ে আন্দোলন গড়ে তুলেছেন, যুদ্ধ করেছেন, শহীদ হয়েছেন এবং দেশকে স্বাধীন করেছেন তাঁদের যথাযথ মূল্যায়ন কখনও হয়নি। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের এবং বিপক্ষের কারও ভূমিকার যথাযথ মূল্যায়ন না করেই একদিকে ঢালাওভাবে আহ্বান জানানো হল অস্ত্র জমা দেওয়ার, অপরদিকে 'সাধারণ ক্ষমা' ঘোষণা করা হল মানবতার ঘৃণ্য শত্রুদের। জাতীয় জীবনে এই স্ববিরোধী কর্মের জের এখনও চলছে। সেদিনের যে সব রাজনৈতিক কর্মী তিল তিল করে তাঁদের শ্রম দিয়ে, রক্ত দিয়ে স্বাধীনতার প্রেক্ষাপট তৈরি করেছেন, আবার অস্ত্র হাতে স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশ নিয়েছেন তাঁরাই দেশ স্বাধীন হওয়ার পর আক্রান্ত হয়েছেন, ফেরার হয়েছেন, নিপীড়িত হয়েছেন এবং নিহত হয়েছেন। আবার অনেকেই যথাযথ মূল্যায়নের অভাবে আত্ম অভিমান নিয়ে চুপসে গেছেন।

রাজনীতিবিদরা এখন পেশাদার মল্লযোদ্ধাদের মতো পরস্পরের প্রতি লোক দেখানো আস্ফালন এবং হুমকি ধমকি করেন। একদিকে জনগণকে রাজাকার ও স্বাধীনতার বিরোধীদেরকে জীবনপণ করে প্রতিহত করার আহ্বান জানানো হচ্ছে অন্যদিকে এই আহ্বানকারীরাই সেই সব রাজাকারদেরকে পরমাত্মীয় বানিয়ে নিজেদের ঘরে তুলে নিয়েছেন। 'স্বাধীনতার মূল্যবোধ' শব্দটি এখন বাজারের পণ্যের মতো নিতান্তই ক্ষুদ্র স্বার্থে ব্যবহার হচ্ছে। মানব ইতিহাসের জঘন্যতম, নৃশংস, নিষ্ঠুর হত্যাকান্ড ঘটানোর পরও যুদ্ধজয়ী স্বাধীন দেশে দোষীদেরকে বা যুদ্ধাপরাধীদেরকে বস্তুনিষ্ট প্রমাণপত্রসহ প্রচলিত বিচার ব্যবস্হায় না এনে লোক দেখানো 'গণ আদালত' বিচারের নামে চলছে প্রহসনমূলক নাটক। একদিকে যেমনি প্রকৃত স্বাধীনতা যোদ্ধাদেরকে পিছনের সারিতে রেখে মাখামাখি চলছে 'মুক্তি-যুদ্ধের সহায়ক শক্তি'কে নিয়ে তেমনি আসল যুদ্ধাপরাধীদেরকে আড়ালে রেখে (যে সব পাকিস্তানি সেনা অফিসারদের নির্দেশে

অথবা নেতৃত্বে ২৫শে মার্চের কাল রাত্রি থেকে তাদের আত্মসমর্পণের আগ পর্যন্ত এ দেশের বুকে সংগঠিত হয়েছিল ইতিহাসের নৃশংসতম হত্যাকান্ড) তাদের দালাল গোষ্ঠী রাজাকারদেরকে নিয়ে চলছে রাজনৈতিক ফায়দা লুটার নানারকম কায়দা।

যাদের নেতৃত্বে আমরা ১৯৬৯-৭১এ আন্দোলন করেছি অস্ত্র হাতে নিয়ে যুদ্ধ করেছি, তাঁরা অজ্ঞাত কারণে আন্দোলন এবং যুদ্ধ সংগঠনের বিষয়ে সম্পূর্ণ নিরবতা পালন করে আছেন। সেই সব নেতৃবৃন্দ ঘটনার বর্ণনা দিলে সেটিই পূর্ণাঙ্গ ও যথার্থ হতো এবং হয়তো আমার এই লেখারও কোন প্রয়োজন পড়তো না। লিখতে বসে কবি গুরুর 'কনিকা' কাব্যের 'কর্তব্য গ্রহণ' কবিতাটির কয়েকটি পঙ্ক্তি বার বার মনে হচ্ছিল-

'কে লইবে মোর কার্য, কহে সন্ধ্যা রবি-
শুনিয়া জগৎ রহে নিরুত্তর ছবি।
মাটির প্রদীপ ছিল; সে কহিল স্বামী,
আমার যেটুকু সাধ্য করিব তা আমি।'

আমার লেখার মধ্য দিয়ে অনেকের কথাই মনে করতে চেষ্টা করেছি কিন্তু প্রায় ত্রিশ বছর পরে শুধু মাত্র স্মৃতির উপর নির্ভর করে লিখতে বসে অনেক কিছুই বা অনেকের কথাই মনে আনা সম্ভব হয়নি, যাদের নাম বা ভূমিকা বাদ পড়েছে তাদের কাছেও আমি ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি।

আমার লেখাটি আমি আমার সেই সব রাজনৈতিক বন্ধু ও সহযোদ্ধা এবং জানা-অজানা শহীদদের উদ্দেশ্যে নিবেদন করছি যাঁরা এই দেশের মাটি ও মানুষকে ভালোবেসেছেন এবং জীবনের বিনিময়ে অন্যায়ের বিরুদ্ধে মাথা উঁচু করে যুদ্ধ করেছেন।

আমি এই লেখার মাধ্যমে বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি আমার একসময়ের রাজনৈতিক জীবনের ঘনিষ্ট সহকর্মী এবং এখনকার ব্যক্তিগত বন্ধু শেখ আতাউর রহমানকে যার আন্তরিক সহযোগিতা এবং উৎসাহ ছাড়া এই লেখাটি কিছুতেই সম্পূর্ণ করা সম্ভব হতোনা।

বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি ফটো সাংবাদিক আফতাব আহমেদ এবং জেনারেল এস.এস. উবানকে যারা তাদের প্রকাশিত ছবি থেকে এই বইয়ে ছাপানোর অনুমতি দিয়ে এই বইটিকে সমৃদ্ধ করেছেন।

শেখ মোহাম্মদ জাহিদ হোসেন

১৪-৩-২০০২

যে আগুন ছড়িয়ে গেল সবখানে...

১৯৬৮ সালে ঢাকা কলেজ থেকে বাণিজ্য বিভাগে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় পাস করার পর একই কলেজে বাণিজ্য বিভাগে ডিগ্রি ক্লাসে ভর্তি হই এবং একটি আকস্মিক ঘটনার মধ্য দিয়ে সরাসরি ছাত্র রাজনীতির সঙ্গে জড়িয়ে পড়ি। তখন ঢাকা কলেজে ছাত্র সংসদের নির্বাচন হতো 'বি.ডি.' (বেসিক ডেমোক্রেসি) সিস্টেমের ক্ষুদ্র সংস্করণে। অর্থাৎ প্রতিটি ক্লাসে ছাত্রদের সরাসরি ভোটে ক্লাস প্রতিনিধি নির্বাচিত করা হতো এবং এই নির্বাচিত ক্লাস প্রতিনিধিরাই আবার ভি.পি. - জি.এস.সহ ছাত্র সংসদের অন্যান্য পদগুলোর নির্বাচন করতেন। বন্ধু-বান্ধবদের অনুরোধে আমি নির্বাচনে অংশগ্রহণ করি এবং তুমুল প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়ে ক্লাস প্রতিনিধি নির্বাচিত হই। এরপর ছাত্র সংসদের রাজনীতিতে না গিয়ে ১৯৬৯ সালে ঢাকা কলেজ ছাত্রলীগের সভাপতি পদের দায়িত্ব পালন করি। আমার সাথে সাধারণ সম্পাদক ছিলেন তাজুল ইসলাম। কলেজ সংসদের সহ-সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক ছিলেন যথাক্রমে ইমাম আবু জাহিদ ও সৈয়দ শাহেদ রেজা।

১৯৬৮-র সময়টা ইতিহাসের প্রসব কাল, চারদিকে একটা অস্হির ভাব - কিছু একটা হয় হয় করেও যেন হচ্ছে না। ৬-দফা ইতোমধ্যেই একটা বিভক্তি রেখা টেনে দিয়েছে পাকিস্তানের দুই অংশের মধ্যে, আঙ্গুল তুলে দেখিয়ে দিয়েছে 'ওরা' আর 'আমরা'। পাকিস্তানে সে সময়ে খুব ঘটা করে আইয়ুব খাঁনের 'উন্নয়নের দশ বছর' পালন করা হচ্ছিল, কিন্তু বেশি ঘটা করে পালন করতে গিয়ে দেশের এ অংশে তার ফল দাঁড়াল উল্টো। উন্নয়নের বাহারি প্রচারে খুশির বদলে বরং বঞ্চনার তুলনাটাই জাগিয়ে দিল মানুষের মনে। এমনি সময়ে আবার গণতান্ত্রিক লেবাস পরা সামরিক সরকার সবদিক থেকে বাজিমাত করার জন্যে শেখ মুজিবুর রহমানকে জড়িয়ে 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা' জনসমক্ষে প্রকাশ করে। ১৯৬৮ সালের জুন মাসে এই মামলার বিচার শুরু হলে সরকারের পক্ষ থেকে খুব হিসেব করেই দেশের সব পত্র-পত্রিকায় এই মামলার বিস্তারিত বিবরণ প্রকাশ করার ব্যবস্হা করা হয়। পাকিস্তানের সামরিক জান্তা হিসেব করেছিল ভারতের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে দেশ বিভক্ত করার এই অপচেষ্টায় শেখ মুজিবকে জড়িয়ে দিতে পারলে দেশের ধর্মপ্রাণ, ভারত বিদ্বেষী সাধারণ মানুষের কাছে তাঁর আর গ্রহণযোগ্যতা থাকবে না। কিন্তু বাস্তবে এসে তাদের সেই হিসেব পাল্টে গেল। দেশের এ অংশের ব্যাপক সংখ্যক বঞ্চিত, মুক্তিকামী জনগণ গভীর আগ্রহ নিয়ে মামলার প্রতিদিনকার বিবরণ খুটিয়ে-খুটিয়ে পড়তেন এবং পাকিস্তানি শাসকদের প্রত্যাশার বিপরীতে শেখ মুজিবসহ অভিযুক্তদের প্রত্যেককে মুক্তিদাতা হিসেবে মনে মনে বীরের আসনে প্রতিষ্ঠিত করেন।

এ সময়ে পশ্চিম পাকিস্তানের দরিদ্র এবং বঞ্চিত জনগোষ্ঠীও আইয়ুব শাহীর উন্নয়নের ফাঁকা বুলিতে প্রচন্ড রোষে ফেটে পড়ে। জণরোষের এই সুযোগ কাজে লাগিয়ে ক্ষমতা গ্রহণের আশায় প্রচন্ড উচ্চাভিলাষী প্রাসাদ রাজনীতিবিদ জুলফিকার আলী ভুট্টো আইয়ুব খাঁনের মন্ত্রীসভা থেকে বের হয়ে ১৯৬৭ সালের ডিসেম্বর মাসে 'পাকিস্তান পিপলস পার্টি' (পিপিপি) গঠন করেন এবং পশ্চিম পাকিস্তানে আন্দোলনের ডাক দেন। ১৯৬৮-র ৭ই নভেম্বর রাওয়ালপিন্ডিতে এক ছাত্র পুলিশের গুলিতে মারা যায়। সামরিক সরকার উৎখাতের সম্ভাবনার মধ্যে দেশের ৮টি বিরোধী রাজনৈতিক দল ঐক্যবদ্ধ হয়ে ১৯৬৯ সালের ৯ জানুয়ারি "গণতান্ত্রিক সংগ্রাম পরিষদ" (DAC) গঠন করেন।

জেল, জুলুম, নির্যাতন আর নিপীড়নের মুখে পূর্ব পাকিস্তানে তখন রাজনৈতিক কর্মকান্ড মূলত ছাত্রসমাজের দ্বারাই পরিচালিত হয়ে আসছিল। রাজনীতি সচেতন প্রগতিশিল ছাত্র সমাজ ঐক্যের প্রয়োজনীয়তা বুঝে গঠন করেন 'ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ' (SAC)। ছাত্রলীগ, ছাত্র ইউনিয়ন (মতিয়া) ও ছাত্র ইউনিয়ন (মেনন) এই তিনটি প্রগতিশিল ছাত্র সংগঠনের নেতৃবৃন্দ এবং ডাকসু'র সহ-সভাপতি তোফায়েল আহমেদ (ছাত্রলীগ) ও ডাকসু'র সাধারণ সম্পাদক নাজিম কামরান চৌধুরী (এন.এস.এফ.[১] দোলন) অনেক আলাপ আলোচনার পর সংগ্রামী ছাত্র সমাজের পক্ষ থেকে ১১-দফা দাবি প্রস্তুত করা হয়। সংগ্রামী ছাত্র সমাজের পক্ষে ১১-দফার প্রচারপত্রে স্বাক্ষরকারিগণ হলেন;

আবদুর রউফ
সভাপতি
পূর্ব-পাকিস্তান ছাত্রলীগ।

খালেদ মোহম্মদ আলী
সাধারণ সম্পাদক
পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ।

সাইফুদ্দিন আহমেদ মানিক
সভাপতি
পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন।

---

[১]এন.এস.এফ. (National Student's Federation), আইয়ুব খাঁনের শাসনআমলে সরকারি মদদপুষ্ট ছাত্র সংগঠন। পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর জনাব মোনায়েম খান এই ছাত্র সংগঠনের প্রধান পৃষ্টপোষক ছিলেন।

সামসুদ্দোহা
সাধারণ সম্পাদক
পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন।

মোস্তফা জামাল হায়দার
সভাপতি
পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন।
দীপা দত্ত
সহ-সম্পাদিকা
পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন।

তোফায়েল আহমেদ
সহ-সভাপতি
ডাকসু।

নাজিম কামরান চৌধুরী
সাধারণ সম্পাদক
ডাকসু।

১৯৬৯-এর ৪ঠা জানুয়ারি (ঐদিনটি ছিল ছাত্রলীগের ২১তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কলা ভবন 'ডাকসু' কার্যালয়ে তৎকালিন ডাকসুর সহ-সভাপতি তোফায়েল আহমেদের সভাপতিত্বে এবং তিন ছাত্র সংগঠনের নেতৃবৃন্দের উপস্হিতিতে এক সাংবাদিক সম্মেলনের মধ্য দিয়ে ছাত্রদের ঐক্যবদ্ধ প্লাটফর্ম 'ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ' গঠনের আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেওয়া হয় এবং ঐক্যবদ্ধ কর্মসূচি ১১-দফা ঘোষণা করা হয়। ১১-দফাকে সমাজের ব্যপক অংশের কাছে গ্রহণযোগ্য করে তোলার লক্ষ্যে এর মধ্যে ৬-দফা দাবির সম্পূর্ন অন্তর্ভূক্তিসহ অন্যান্য রাজনৈতিক দাবি এবং জগন্নাথ কলেজ, কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, মেডিকেল কৃষিসহ শিক্ষা ক্ষেত্রের দাবি ও কৃষক-শ্রমিকদের মূল দাবিসমূহ অন্তর্ভূক্ত করা হয়। ১১-দফা ঘোষণার অল্প কিছুদিন পরেই সরকার সমর্থিত ছাত্র সংগঠন 'এন.এস.এফ' এর একটি বিদ্রোহী গ্রুপ মাহাবুবুল হক দোলন এবং ডাকসু সাধারণ সম্পাদক নাজিম কামরান চৌধুরীর নেতৃত্বে ১১-দফার প্রতি তাদের সমর্থন ও একাত্মতা ঘোষণা করে 'ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ'এ যোগ দেন।

ছাত্রদের ঐক্যবদ্ধ প্লাটফর্ম 'ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ' গঠনের সঙ্গে সঙ্গে ছাত্র কর্মী এবং সাধারণ ছাত্রদের মধ্যে আন্দোলনের পক্ষে ব্যাপক উৎসাহ ও সাড়া পড়ে যায়। ১১-দফার ভিত্তিতে ছাত্র আন্দোলন দ্রুত বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ ও স্কুলের চত্বর পার হয়ে জনতার কাতারে নেমে আসে। '৬৯-এর ১৭ই জানুয়ারি ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের উদ্যোগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কলাভবনের বটতলায় ছাত্র জমায়েতের মাধ্যমে ১১-দফা

আন্দোলনের প্রথম কর্মসূচী ঘোষণা করা হয়। সমাবেশের শেষ পর্যায়ে ছাত্র নেতৃবৃন্দের পক্ষ থেকে তাৎক্ষণিকভাবে ১৪৪ ধারা ভঙ্গের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এ সময়ে কলা ভবনের গেট থেকে প্রথমে ১৪৪-ধারা আইনকে পাশ কাটিয়ে ৪ জন করে ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র মিছিল বের করার চেষ্টা করা হলে পুলিশ বাহিনী কাঁদুনে গ্যাস ও রায়ট কারের সাহায্যে লাল পানি নিক্ষেপ করে এবং ব্যাপক লাঠি চার্জ করে। সংঘর্ষের এক পর্যায়ে কিছু ছাত্রকে গ্রেফতারও করা হয়। গ্রেফতারের প্রতিবাদে দুপুরের দিকে ছাত্ররা পুনরায় বটতলায় সমবেত হয়। ছাত্র নেতৃবৃন্দ বিশ্ববিদ্যালয়ের পবিত্র অঙ্গনে পুলিশী নির্যাতনের নিন্দা করেন এবং এর প্রতিবাদে ১৮তারিখ শনিবার ঢাকা শহরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে ধর্মঘট পালনের আহ্বান জানানো হয়।

১৮ তারিখ সকালে বটতলায় ছাত্র জমায়েতের পর, গতকালের অভিজ্ঞতার আলোকে, পূর্ব প্রস্তুতির মাধ্যমে অনেকগুলো খন্ড-খন্ড মিছিল একসাথে কলাভবনের বিভিন্ন গেট দিয়ে বের হয়ে টি.এস.সি মোড় পর্যন্ত এগিয়ে যায় কিন্তু সেখানে পুলিশের লাঠিচার্জ, কাঁদানে গ্যাস ও রায়ট কারের সাহায্যে লাল পানি নিক্ষেপের ফলে মিছিলগুলো ছত্রভঙ্গ হয়ে পুনরায় কলাভবনে এসে আশ্রয় নেয়। আগের দিনের কাঁদানে গ্যাসের অভিজ্ঞতায় কলা ভবনের বারান্দায় বেশ কিছু পানি ভর্তি বালতি রাখা হয় এতে ছেলেরা রুমাল, গেঞ্জি, গায়ের জামা ইত্যাদি খুলে ভিজিয়ে নিজেদের চোখে মুখে দিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে যায়। ছেলেদের পাশাপাশি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীরাও এ সময়ে বালতি ভর্তি পানি, রুমাল ইত্যাদি যোগান দিয়ে সাহায্য করতে থাকে। যে সব কাঁদানে গ্যাসশেল কলা ভবনের বারান্দায় এসে পড়ে সেসবের উপরে বস্তা ভিজিয়ে চাপা দেওয়া হলে গ্যাসের কার্যকারিতা হ্রাস পায়। কিছু কাঁদানে গ্যাসশেল এ ভাবে ভিজা বস্তা দিয়ে চেপে ধরে ছাত্ররা সেগুলোকে পুনরায় পুলিশের দিকে ছুঁড়ে দেয় এতে পুলিশের বেশ বিছু সদস্যও অসুস্থ হয়ে পড়ে। এরপরও প্রচন্ড কাঁদানে গ্যাস নিক্ষেপের ফলে প্রায় ১৫০জন ছাত্র অসুস্থ হয়ে পড়লে তাদেরকে চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে পাঠাতে হয়। সন্ধ্যায় ই.পি.আর.[২] বাহিনী জিন্নাহ হল (বর্তমানে সূর্যসেন হল) ও ইকবাল হলে (বর্তমানে সার্জেন্ট জহুরুল হক হল) প্রবেশ কোরে ছাত্রদের লাঠিপেটা করে এবং ২০ জন ছাত্রকে ধরে নিয়ে যায়। সরকারি নির্যাতন ও গ্রেফতারের প্রতিবাদে, গ্রেফতারকৃত ছাত্রদের মুক্তির দাবিতে এবং ১১-দফা দাবির সমর্থনে কোন মাসের ২০ তারিখ প্রদেশব্যাপি (পূর্ব পাকিস্তানে) ছাত্র ধর্মঘট আহ্বান করা হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদের উপর পুলিশ ও ই.পি.আর. বাহিনীর

---

[২] ই.পি.আর. (ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস) একটি আধা সামরিক সীমান্ত রক্ষী বাহিনী। বিশেষ জরুরী প্রয়োজনে অভ্যন্তরীণ কাজে ব্যবহার করা হয়।

অত্যাচারের নিন্দা করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতিসহ বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনের পক্ষ থেকে (বিশেষ করে এন.এস.এফ. কেন্দ্রিয় সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক সাইফুল্লাহ চৌধুরী ও জমির আলী) এবং আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে বিবৃতি দেওয়া হয়। (১৯ তারিখ রোববার স্কুল ও কলেজে সাপ্তাহিক ছুটির দিন থাকায় সেইদিন কোন কর্মসূচী রাখা হয় নি)।

২০শে জানুয়ারি বিশ্ববিদ্যালয়ের বটতলায় আরও ব্যাপক ছাত্র সমাবেশ ঘটে এবং সমাবেশে ছাত্রনেতাদের সংক্ষিপ্ত ভাষণ শেষে কলাভবনের গেট দিয়ে এক এক করে মিছিল টি.এস.সি মোড় হয়ে মেডিকেল কলেজের দিকে এগিয়ে যায়। জগন্নাথ কলেজ ও কায়েদ আযম কলেজের (বর্তমানে সোহরাওয়ার্দী কলেজ) একটি বিশাল জঙ্গী মিছিল প্রথমেই ঢাকা মেডিকেল কলেজের পাশ দিয়ে রেলওয়ে হাসপাতাল হয়ে নবাবপুরের দিকে চলে যায়। অপর একটি মিছিল ঢাকা মেডিকেল কলেজের সামনে থেকে বিভক্ত হয়ে কার্জন হলের কাছে পৌছানোর পর এর মাঝের অংশে (ঢাকা মেডিকেল কলেজের মূল ফটকের সামনে) পুলিশ সার্জেন্টের গুলিতে শহীদ হন ছাত্র ইউনিয়ন (মেনন) গ্রুপের একনিষ্ঠ কর্মী আসাদুজ্জামান আসাদ। আসাদ হত্যার খবর ছড়িয়ে পড়ার সাথে সাথে প্রচন্ড বিক্ষোভে ফেটে পড়ে ছাত্রসমাজ। বিকেলে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রীরা ঢাকা মেডিকেল কলেজের সামনে জমায়েত হয়ে শোক সভায় মিলিত হন। শোক সভায় ডাকসু সহ-সভাপতি তোফায়েল আহমেদ ও ছাত্র ইউনিয়নের সভাপতি সামসুদ্দোহা সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা দেন এবং সভা শেষে কালো পতাকা সহ ছাত্র-ছাত্রীরা দুই লাইন করে একটি বিশাল মৌন মিছিল বের করে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন হল থেকেও শিক্ষকদের নেতৃত্বে ছাত্ররা নগ্ন-পদে কালো ব্যাজ ধারণ করে শোক মিছিল বের করেন ও বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা এবং শহরের বিভিন্ন রাস্তা প্রদক্ষিণ করেন। আসাদ হত্যার প্রতিবাদে সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রম পরিষদের পক্ষ থেকে ২৪ জানুয়ারি ঢাকা শহরে হরতাল ডাকা হয় এবং ব্যাপক আকারের ছাত্র-গণ বিক্ষোভ মিছিলের ঘোষণা দেওয়া হয়।

২৪শে জানুয়ারি ঢাকা শহরের রাস্তায়-রাস্তায় প্রায় সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকেই বিক্ষোভ মিছিল বের করা হয়, ছাত্র-গণমিছিলে গুলিতে শহীদ হয় ঢাকার নবকুমার ইনস্টিটিউটের নবম শ্রেণীর ছাত্র মতিউর রহমান। ক্ষুব্ধ ছাত্র-জনতা সরকার নিয়ন্ত্রিত পত্রিকা "দৈনিক পাকিস্তান" ও "মর্নিং নিউজ" এবং আইয়ুবের পদলেহি পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর মোনায়েম খানের "পয়গাম" পত্রিকা অফিস ছাড়াও কতিপয় মন্ত্রীর বাড়ি ভাঙ্চুর করে ও আগুন লাগিয়ে দেয়। ছাত্র আন্দোলন আরো ব্যাপক এবং জঙ্গি রুপ ধারণ করে। সরকারের পক্ষ থেকে সহিংসতার আশংকা করে ঐ দিন ঢাকা শহরে 'সান্ধ্যআইন' জারি করা হয় কিন্তু এ দেশের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো মানুষ কারফিউ ভঙ্গ করে রাস্তায় বের হয়ে আসে। অন্যায়, অত্যাচার, নির্যাতন আর খুনের

প্রতিবাদে দেশের শ্রমিক সমাজ, মধ্যবিত্ত ও বুদ্ধিজীবী মহল এ সময়ে ছাত্রদের আন্দোলনে যোগ দেন। ছাত্র আন্দোলন রূপ নেয় গণ-আন্দোলনে এবং ছড়িয়ে পড়ে সারা দেশে, শহীদদের তালিকায় যোগ হয় আরও কয়েকটি নাম আনোয়ার, রুস্তম, মিলন, আলমগীরসহ আরো অনেক নাম। বিক্ষোভ দমনের শেষ চেষ্টা হিসেবে দেশের বিভিন্ন অংশে সেনাবাহিনী নামানো হয়।

১৫ ফেব্রুয়ারি ঢাকা সেনানিবাসে সার্জেন্ট জহুরুল হকের হত্যাকাণ্ডকে কেন্দ্র করে প্রদেশব্যাপী যে আগুন জ্বলে উঠে তারই জের ধরে ১৮ ফেব্রুয়ারি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে সেনাবাহিনীর গুলিতে নিহত হন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ড.শামসুজ্জোহা এবং গুরুতর আহত হন আরও তিনজন শিক্ষক। ছাত্র-শিক্ষকের উপর সেনাবাহিনীর গুলি এবং প্রিয় শিক্ষক হত্যা ও আহত হওয়ার খবর বিদ্যুত গতিতে ঢাকাসহ সারা পূর্বপাকিস্তানে ছড়িয়ে পড়লে, কোনও প্রকার পূর্বপ্রস্তুতি ছাড়াই মানুষ রাতের কারফিউ ভঙ্গ করে রাস্তায় বের হয়ে আসে, বিভিন্ন সরকারি স্থাপনায় হামলাসহ উন্মত্ত শ্রমিক-জনতা টঙ্গী এবং দেশের বিভিন্ন এলাকায় রেল লাইন উপড়ে ফেলে। দেশের এ অংশে সরকারি প্রশাসন সম্পূর্ন ভেঙ্গে পড়ে, পশ্চিম পাকিস্তানেও আন্দোলন সহিংস রূপ ধারণ করে, পরিস্থিতির ভয়াবহতা আইয়ুব খাঁনকে জানানো হয়। প্রেসিডেন্ট ফিল্ড-মার্শাল জেনারেল আইয়ুব খাঁন যেকোন উপায়ে ক্ষমতা আকড়ে রাখার চেষ্টায় মরিয়া হয়ে সামরিক বাহিনীর তিন প্রধানের সাথে বৈঠকে বসেন। কিন্তু দেশের উভয় অংশে সহিংস রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে এবং মানুষ স্বতস্ফূর্তভাবে কারফিউ ভঙ্গ করে রাস্তায় বের হয়ে আসায় এর পরবর্তিতে ভয়াবহ সংঘর্ষের আশংকা কোরে তাঁর বাহিনী প্রধানরা সামরিক শক্তি প্রয়োগ করতে অস্বীকার করেন। তাঁরা আইয়ুব খাঁনের প্রতি রাজনৈতিকভাবে এই সমস্যা সমাধানের আহ্বান জানান। এই পরিস্থিতিতে আইয়ুব খাঁন কার্যত ক্ষমতাহীন হয়ে পড়েন, তাঁর কাছে শেখ মুজিবকে মুক্তি দিয়ে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আলাপ আলোচনায় বসা ছাড়া অন্য কোনও উপায় রইল না। এই বেসামাল পরিস্থিতিতে আইয়ুব খাঁন 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা' প্রত্যাহার ও শেখ মুজিবসহ সব অভিযুক্তদের মুক্তি ঘোষণা করেন এবং গোল টেবিল বৈঠকে বসার জন্য রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের প্রতি পুনরায় আহ্বান জানান।

'৬৯-এর ৪ঠা জানুয়ারি ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ গঠন হওয়ার পর মাত্র ৮১দিনের অপ্রতিরোধ্য আন্দোলনের ফলে ২৫শে মার্চ আইয়ুব শাহীর পতন হয়। কিন্তু তাঁকে বিদায় করে দিয়ে ক্ষমতার মসনদে আসিন হন আর এক সামরিক জেনারেল, তৎকালিন সেনা প্রধান জেনারেল ইয়াহিয়া খাঁন। ক্ষমতার হাত বদলের মধ্য দিয়ে শুরু হয় ষড়যন্ত্রের আর এক নতুন অধ্যায়।

জহুরের রক্ত স্বাধীনতার মন্ত্র : স্বাধিকার না স্বাধীনতা

১৯৬৯-এর ১৫ই ফেব্রুয়ারি আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় ঢাকা সেনানিবাসে বন্দী অবস্হায় গুলি করে হত্যা করা হয় ফ্লাইট সার্জেন্ট জহুরুল হককে। সরকার একটি প্রেসনোট দিয়ে বুঝাতে চাইল যে সকালে প্রাত্যহিক কাজের সময় পালাতে গিয়ে সেনা-প্রহরীর গুলিতে গুরুতররূপে আহত সার্জেন্ট জহুরুল হক রাত ৯টা ৫০ মিনিটে কম্বাইন্ড মিলিটারি হাসপাতালে ইন্তেকাল করেন এবং আহত ফ্লাইট সার্জেন্ট ফজলুল হকের অবস্থা উন্নতির দিকে। কিন্তু এই সরকারি বক্তব্য পূর্ব-পাকিস্তানের জন-মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য বা বিশ্বাসযোগ্য ছিল না। ফলে বিক্ষোভে ফেটে পড়ে সারা দেশ, আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার বিশেষ ট্রাইব্যুনাল চেয়ারম্যান জনাব এস.এ. রহমান, পাকিস্তান কেন্দ্রীয় তথ্য ও বেতার মন্ত্রী খাজা শাহাবউদ্দিন, পূর্ব পাকিস্তানের প্রাদেশিক যোগাযোগ মন্ত্রী সুলতান আহমেদ, প্রাদেশিক পূর্ত মন্ত্রী মং সু প্রু ও প্রাদেশিক কনভেনশন মুসলিম লীগের সভাপতি নওয়াব হাসান আসকারির বাস ভবনে আগুন লাগানো হয়। দেশ জুড়ে স্লোগান উঠে 'জহুরের রক্ত - স্বাধীনতার মন্ত্র', 'পিন্ডি না ঢাকা - ঢাকা, ঢাকা', 'তোমার আমার ঠিকানা - পদ্মা মেঘনা যমুনা', 'কুর্মিটোলা ভাঙব - শেখ মুজিবকে আনব' ইত্যাদি।

এ সময়ে ভিতরের এবং বাইরের প্রচন্ড চাপে বেসামাল হয়ে পড়েন প্রেসিডেন্ট জেনারেল আইয়ুব খাঁন। দেশের রাজনৈতিক সংকট কাটিয়ে উঠার জন্যে সরকারের পক্ষ থেকে বিরোধী দলগুলোর প্রতি গোল টেবিল বৈঠকের প্রস্তাব দেওয়া হয়। মজলুম জননেতা মওলানা ভাসানী এবং সংগ্রামী ছাত্র সমাজ এক কথায় জানিয়ে দেন 'শেখ মুজিবকে ছাড়া কোনো আলোচনা হবে না'। অবশেষে সরকারের পক্ষ থেকে 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা' প্রত্যাহার করার কথা ঘোষণা করা হয় এবং শেখ মুজিবসহ বিরোধী নেতৃবৃন্দকে গোল টেবিল বৈঠকে যোগ দেওয়ার আমন্ত্রণ জানানো হয়।

১৯৬৬ সালে ৬-দফা ঘোষণার পর হয়রানি এবং 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায়' একটানা কারা নিবাস শেষে ১৯৬৯-এর ২২শে ফেব্রুয়ারি শেখ মুজিবুর রহমানকে মুক্তি দেওয়া হয়। মুক্তির সাথে সাথে 'ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের' পক্ষ থেকে ২৩শে ফেব্রুয়ারি রমনা রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমানে সোহরাওয়ার্দি উদ্যান) দীর্ঘদিনের কারাবন্দি বাঙালির প্রাণপ্রিয় এই নেতার গণ-সংবর্ধনার আয়োজন করা হয়।

তখন ছাত্রলীগে নিজেদের মধ্যেই অভ্যন্তরীণ গ্রুপিং চলছে 'স্বাধীনতা না স্বায়ত্বশাসন' এই প্রশ্ন নিয়ে। আমরা যারা ছাত্রলীগের মাঠ কর্মী ছিলাম তারা প্রায় সবাই স্বাধীনতার চেতনায় উদ্বুদ্ধ। মিছিল, মিটিং, স্লোগান, পোস্টার, লিফলেট, দেয়ালের লিখন সবখানেই প্রতিফলিত আমাদের সেই আকাঙ্ক্ষার কথা। কিন্তু দলের কিছু নেতা এবং তাদের মুষ্টিমেয় কয়েকজন কর্মী তখন বিভ্রান্তি ছড়িয়ে বেড়াচ্ছে যে, স্বয়ং শেখ মুজিবর রহমান আমাদের বিপক্ষে। ২৩তারিখ সকালেই আমরা তোফায়েল আহমেদের নেতৃত্বে শেখ মুজিবর রহমানের সঙ্গে তাঁর ধানমন্ডির বাসভবনে দেখা করি এবং আমরা সাক্ষাতে মূলত ২টি দাবি নিয়ে নেতাকে অনুরোধ জানাই (১) গোল

টেবিল বৈঠকে নেতা যেন যোগ না দেন এবং (২) মঞ্চ থেকে নেতা যেন 'জয় বাংলা' স্লোগানটি দেন। পাইপ হাতে নিয়ে নেতা আমাদের কথা খুবই মনযোগ দিয়ে শুনলেন তারপর শুধু বললেন 'আমি অনেকদিন জেলে ছিলাম, কেবল মাত্র বাইরে এসেছি, এর মধ্যে ঘটনা-পরিস্হিতি অনেক বদলেছে, আগে সকলের সাথে আলাপ-আলোচনা করি, দেখি, বুঝি তারপর কী করতে হবে, কী বলতে হবে সেটা ঠিক করব।' এরপর আলোচনা প্রসঙ্গে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীকে উনার নেতা সম্বোধন করে বললেন, 'আমার নেতা শিখিয়েছেন- জনগণের নেতা হতে চাইলে জনগণ কী চায় সেটা বুঝার চেষ্টা করবে, জনগণ যা চায় তাই করবে, জনগণ যা শুনতে চায় তাই বলবে, এবং আমি আমার নেতার কথা মতোই চলব' তাঁর এই সহজ, সরল, খোলামেলা উক্তি থেকে আমরা আমাদের করণীয় দিকনির্দেশনা পেয়ে গেলাম।

ধানমন্ডি ৩২ নম্বর রোডের বাসা থেকে বের হয়েই সিরাজুল আলম খানের নির্দেশে আমরা সারা ঢাকা শহরে ছড়িয়ে পড়লাম। আঞ্চলিক শাখার কর্মীদেরকে খবর দেওয়া হল আসার পথে মিছিলে এবং রেসকোর্স ময়দানে মিটিংএর সময়ে অন্যান্য স্লোগানগুলোর সাথে যেন 'গোল টেবিল না রাজপথ - রাজপথ রাজপথ', 'জ্বালো জ্বালো - আগুন জ্বালো' এবং 'জয় বাংলা' এই স্লোগান ৩টি অবশ্যই যেনো দেওয়া হয়। আমরা নেতৃস্হানীয় কয়েকজন কর্মী মিলে কয়েকটা মোবাইল টিম গঠন করে নিজেরা দায়িত্ব নিলাম রেসকোর্স ময়দানে ঘুরে ঘুরে এই স্লোগানগুলো দেয়ার। এ ছাড়াও স্টেজের উপরে, ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের অন্য দলের আপত্তি সত্বেও (যেহেতু এই স্লোগানটি ছাত্রলীগের নিজস্ব স্লোগান), 'জয় বাংলা' লিখা একটি বড় ব্যানার টানিয়ে দেয়া হয়। ইতিহাস স্বাক্ষ দেবে আমাদের সেদিনকার সেই চেষ্টা এবং কষ্ট বৃথা যায়নি। তোফায়েল আহমেদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই সংবর্ধনা সভায় এতদিনের সভা পরিচালনার প্রচলিত নিয়ম-নীতি ভেঙ্গে সভাপতি আগেই তাঁর বক্তব্য শেষ করলেন। কেননা, সভায় উপস্হিত সকলে উদগ্রীব হয়ে ছিল শেখ মুজিবুর রহমানের কথা শোনার জন্য। বিশাল সেই জনসভায় তোফায়েল আহমেদ শেখ মুজিবকে 'বঙ্গবন্ধু'[৩] উপাধিতে ভূষিত করেন, যে উপাধি বিতর্কের উর্ধে বাঙালির হৃদয়ে এখনও অম্লান হয়ে আছে।

---

[৩] ৩রা নভেম্বর, ১৯৬৮ সালে ঢাকা কলেজ ছাত্রলীগের পক্ষ থেকে প্রকাশিত 'প্রতিধ্বনি' নামক মাসিক বুলেটিনে তৎকালিন ঢাকা কলেজ ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক ও ঢাকা নগর ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক, জনাব রেজাউল হক চৌধুরী মুশতাক 'সারথী' ছদ্মনামে 'আজবদেশ' শিরোনামে তাঁর একটি লেখায় ৬-দফা প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে বাঙালির প্রাণপ্রিয় এই নেতার নামের পাশে 'বঙ্গবন্ধু' শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন। রেজাউল হক চৌধুরী মুশতাক প্রদত্ত এই নতুন উপাধিটি সে সময়ে ছাত্র নেতাদের মধ্যে যথেষ্ট আলোচিত হয় এবং সকলের নিকটই উপাধিটি শেখ মুজিবুর রহমানের জন্যে সবচেয়ে উপযুক্ত বলে বিবেচিত হয় (এর আগে 'বঙ্গবন্ধু'কে সাধারণত 'বঙ্গ-শার্দুল' বলে সম্বোধন করা হতো। কিন্তু এই উপাধিটি 'শেরে বাংলা'র সমার্থক হওয়ায় আমরা এটি ব্যবহার করা নিয়ে খুবই দ্বিধান্বিত ছিলাম)। জনাব তোফায়েল আহমেদ তাঁর দেওয়া 'বঙ্গবন্ধু' উপাধিটি রেজাউল হক চৌধুরী মুশতাকের এই লেখা থেকেই গ্রহণ করা হয় বলে পরবর্তিতে বিভিন্ন আলোচনা সভায় স্বীকার করেন।

ঢাকার ইতিহাসে প্রথম সর্ববৃহৎ জনসমাবেশে দীর্ঘ কারাভোগের পর আবেগে আপ্লুত 'বঙ্গবন্ধু' সেদিন তাঁর কথা রেখেছিলেন। গোল টেবিল বৈঠকে যোগদানের শর্ত হিসেবে তিনি দাবি জানালেন পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের পরবর্তী নির্বাচনেই পূর্ব পাকিস্তানকে জনসংখ্যাভিত্তিক প্রতিনিধিত্ব দিতে হবে[৪]। সভায় উপস্থিত ছাত্রদের আশ্বাস দিয়ে তিনি বলেন 'আপনারা নিশ্চিন্ত থাকুন। আমি যদি এদেশের মুক্তি আনতে ও জনগনের দাবি আদায় করতে না পারি তবে আন্দোলন করে আবার কারাগারে যাব।' জনসভায় শেখ মুজিব গোল টেবিলে যাওয়ার জন্য জনগণের ম্যান্ডেট (হাত তুলে সমর্থন) গ্রহণ করলেন এবং বললেন, গোল টেবিল বৈঠকে তিনি বাঙালি জনগণের দাবি তুলে ধরবেন। একই সংগে তিনি ওয়াদা করলেন, ঐসব দাবি যদি মেনে নেওয়া না হয় তাহলে ফিরে এসে আন্দোলন চালিয়ে যাবেন। কিছুতেই আপোস করবেন না।

স্টেজের উপর 'জয় বাংলা' লেখা ব্যানার এবং ছাত্র ও জনগণের প্রতি তাঁর বলিষ্ঠ আশ্বাস ও গোল টেবিল বৈঠকে যোগদানের শর্ত জুড়ে দেওয়ায় সেদিন আমাদের নৈতিক বিজয় সাধিত হয়। এই বিজয় দলের মধ্যকার স্বাধীনতাপন্থীদের শক্তিকে আরও উৎসাহিত এবং অপ্রতিরোধ্য করে তোলে।

---

[৪] ২৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯ রাওয়ালপিন্ডিতে গোল টেবিল বৈঠকের উদ্বোধন করেন পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খাঁন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এই বৈঠকে যোগ দিয়ে বাংলার জনগণের স্বার্থ উর্ধে তুলে ধরে সব ক্ষেত্রে (জাতীয় পরিষদে প্রতিনিধিত্ব এবং চাকরির কোটায়) জনসংখ্যার ভিত্তিতে প্রতিনিধিত্ব এবং ৬-দফার ভিত্তিতে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের দাবি জানান। বৈঠকে যোগদানকারী অন্যান্য দলগুলোর মধ্যে ছিল আওয়ামী লীগ থেকে বেরিয়ে যাওয়া আব্দুস সালাম খান, জামায়াতে ইসলামির মওদুদি ও গোলাম আজম, কাউন্সিল মুসলিম লীগ, জমিয়তে ওলামায়ে ইসলাম, নেজামে ইসলামের মৌলভি ফরিদ আহমেদ প্রমুখ। ইসলাম পছন্দ দলগুলো নবাবজাদা নসরুল্লাহ খানের নেতৃত্বে একজোট হয়ে স্বায়ত্তশাসন তথা পাকিস্তানের এক ইউনিট ভাঙ্গার বিরোধিতা করে। অপরদিকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর এই দুইটি দাবির প্রতি অনড় থাকায় কোন প্রকার সিদ্ধান্ত ছাড়াই গোল টেবিল বৈঠকের সমাপ্তি ঘটে। নবাবজাদা নসরুল্লা খান প্রতিদিন হুক্কা নিয়ে সম্মেলনে যোগ দেওয়ার কারণে এই ব্যর্থ গোল টেবিল বৈঠক পরবর্তিতে "হুক্কা সম্মেলন" নামে পরিচিতি লাভ করে।

ফেব্রুয়ারি বাহিনী, জহুর বাহিনী ও নিউক্লিয়াস

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, ১৯৬৯-এর ১৫ই ফেব্রুয়ারি ঢাকা সেনানিবাসে 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা'য় বিচারাধীন বন্দি ফ্লাইট সার্জেন্ট জহুরুল হককে গুলি করে হত্যা করা হয়। জহুরের মধ্যে মুক্তিকামি বাঙালি খুঁজে পায় তাদের কাঙ্খিত বীর নায়ককে। সে সময়ে আমরা যারা দলের মধ্যে স্বাধীনতা পন্থী ছিলাম তারা মিলিত হয়ে গঠন করি 'জহুর বাহিনী' (প্রথমে অবশ্য মধ্য প্রাচ্যের একটি গেরিলা সংগঠনের নামের অনুকরণে সার্জেন্ট জহুরের শহীদ হওয়ার দিনটি স্মরণ করে এই বাহিনীর নাম দেওয়া হয়েছিল 'ফেব্রুয়ারি-১৫ বাহিনী')। জহুর বাহিনীর পক্ষ থেকে সে সময়ে ২টি ব্যাজ ছাপা হয়, একটিতে রক্তের ছোপের মতো রংয়ের মধ্যে লেখা ছিল 'জহুরের রক্ত স্বাধীনতার মন্ত্র' অপরটিতে লাল সূর্যের মধ্যে লেখা ছিল 'জয়-বাংলা'। এস.এম. হল, শহীদ মিনার ও প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঝখানের জায়গায় এই বাহিনীর পক্ষ থেকে কুচ-কাওয়াজের প্রশিক্ষণ দেওয়া হতো। ধীরে ধীরে এই কুচ-কাওয়াজ এবং স্বাধীনতার আলাপ-আলোচনা স্কুল কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, হল এবং আঞ্চলিক শাখার কর্মীদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। (১) স্বাধীনতা, (২) সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি এবং (৩) ধর্মনিরপেক্ষতা এই ছিল আমাদের মূল চিন্তাধারা মূলত এই চিন্তাধারা নিয়েই ছিল আমাদের দলের ভেতরকার গ্রুপিং পরবর্তীতে এই চিন্তাধারার উপর ভিত্তিকরে এর সঙ্গে 'গণতন্ত্র' যুড়ে দিয়ে রাষ্ট্রীয় ৪ মূলনীতি প্রণয়ন করা হয়।

ব্রিটিশ ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম, রাশিয়া ও চীনের সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব এবং ল্যাটিন আমেরিকাসহ বিশ্বের অন্যান্য দেশের গেরিলা সংগ্রামের ইতিহাস পড়ে আমাদের মধ্যে বিপ্লবী সংগঠনের ভাবধারা জন্ম নেয়। সে সময়ে আমাদের আবশ্য পাঠ্য বইগুলোর মধ্যে ছিল ল্যাটিন আমেরিকার বিপ্লবী চে-গুয়েভরার উপর ফরাসি লেখক রেজিস ডেবরের লেখা 'REVOLUTION IN THE REVOLUTION', রাশিয়ার বিপ্লবের উপর আমেরিকান সাংবাদিক জন রীডের লেখা 'দুনিয়া কাঁপানো দশ দিন', ম্যাক্সিম গোর্কি'র লেখা 'আমার ছেলেবেলা', 'পৃথিবীর পথে', 'পৃথিবীর পাঠশালায়', 'মা', মাও সে তুং এর বিভিন্ন লেখা, 'কমিউনিস্ট পার্টির ইশতেহার', শৈলেশ দে'র 'আমি সুভাষ বলছি' এ ছাড়াও সত্যেন সেনের 'মহা বিদ্রোহের কাহিনী', 'বীর কন্যা প্রীতিলতা', 'মাষ্টারদা সূর্যসেন' ইত্যাদি বই।

আমাদের নিজেদের নেতারা ছাড়াও সে সময়ে আগরতলা মামলার অন্যতম অভিযুক্ত সুলতান উদ্দিন আহমেদ নিজে এসে আমাদেরকে মাঝে মাঝে বিভিন্ন অস্ত্রের গঠনপ্রকৃতি এবং এসবের ব্যবহার বিধি সম্পর্কে ধারণা দিতেন। এ ছাড়াও গেরিলা সংগঠনের গঠন, কর্মপদ্ধতি ও গেরিলা যুদ্ধনীতি সম্মন্ধেও শিক্ষা দেওয়া হত।

এভাবে স্বাধীনতার স্বপ্ন আর আকাঙ্খা আমাদের কর্মীদের মধ্যে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। পাড়ায়, মহল্লায়, স্কুলে, কলেজে, বিশ্ববিদ্যালয়ে, হলে, সবখানে ছাত্রলীগ কর্মীদের মধ্যে শুরু হয় স্বাধীনতা সংগ্রাম বা বিপ্লবের রোমাঞ্চকর প্রস্তুতি।

ছাত্রলীগের স্বাধীনতাপন্থী নেতা কর্মীরা ১৯৬৯-৭১ সালে মূলত পরিচালিত অথবা নিয়ন্ত্রিত হতেন, সিরাজুল আলম খানের নির্দেশে কাজী আরেফ আহমেদ এবং মনিরুল ইসলামের (মার্শাল মনি) দ্বারা। শেষের দু-জনই ছিলেন আমাদের নগর কর্মীদের সঙ্গে সিরাজুল আলম খানের যোগাযোগের সূত্র। সে সময়ে দলের মধ্যে আমরা যারা স্বাধীনতাপন্থী হিসেবে পরিচিত ছিলাম তাদের মধ্যে একটা খুবই চালু পছন্দের শব্দ ছিল 'নিউক্লিয়াস'। কোথা থেকে, কীভাবে এবং কাদের দ্বারা এর উৎপত্তি সেটা হয়ত তৎকালিন মূল নেতৃবৃন্দ (বর্তমানে জীবিত সিরাজুল আলম খান এবং আব্দুর রাজ্জাক) বলতে পারবেন। তবে, কোন পর্যন্ত এর বিস্তৃতি বা কোথায় এর শেষ সেটি হয়ত উনারাও বলতে পারবেন না, কেননা এর রিক্রুটমেন্ট এবং গঠন পদ্ধতি ছিল কিছুটা ভিন্ন ধরনের। আমাদের উপর নির্দেশ ছিল ছাত্রলীগের সমমনা, ত্যাগী ও পরীক্ষিত কর্মীদের মধ্য থেকে ১০ জন বেছে নিয়ে একটি করে গ্রুপ তৈরি করার জন্যে এবং বলা হয়েছিল, এই ১০ জনের প্রত্যেকে আবার অনুরূপভাবে পরীক্ষিত ১০ জন করে কর্মী নিয়ে আলাদা আলাদা গ্রুপ গঠন করতে। এরকম একেকটি গ্রুপ নিয়েই গড়ে উঠে একেকটি 'নিউক্লিয়াস'। তবে কঠোরভাবে নির্দেশ দেওয়া ছিল প্রতিটি গ্রুপের সাথে কোনও ভাবেই যেন অন্য গ্রুপের কারও পরিচয় না করানো হয়। যদিও গোপনীয়তা রক্ষা করা এবং ব্যাপক হারে ধরা পড়ার সম্ভাবনা কমানোর জন্যেই বিশ্বব্যাপি বিপ্লবী সংগঠনগুলোর মধ্যে এইভাবে আলাদা করে গ্রুপ গঠন করার নিয়ম চালু ছিল; কিন্তু বিশাল সংগঠন, এর গণচরিত্র এবং অনেক ত্যাগী কর্মীদের ভীড়ে বাস্ত বে আমাদের পক্ষে সে রকম গোপনীয়তা রক্ষা করা একেবারেই সম্ভব ছিল না। সে সময়ে কর্মীদের মধ্যে 'নিউক্লিয়াসভূক্ত' হওয়াটা মর্যাদার বিষয় হয়ে দাড়ায়। বিপুল সংখ্যক কর্মী 'নিউক্লিয়াসভুক্ত' হওয়ার জন্যে এবং গোপন আলোচনায় অংশ নেওয়ার জন্যে শুধু আগ্রহই প্রকাশ করত না বরং রীতিমত সাংগঠনিক চাপ সৃষ্টি করত।

১৯৬৯-এর ২৫শে মার্চ জেনারেল ইয়াহিয়া খাঁনের ক্ষমতা গ্রহণ, মার্শাল-ল জারি ও দেশে রাজনৈতিক কর্মকান্ড নিষিদ্ধ ঘোষণা করায় ব্যাপক হারে ধরা পড়ার আশংকায় আমরা ছাত্রলীগের বিভিন্ন স্তরের নেতা কর্মীরা পরিস্থিতি আঁচ করার জন্যে সাময়িকভাবে আত্মগোপন করি এবং তখন এই 'নিউক্লিয়াস' গঠন প্রক্রিয়া আমাদের কর্মীদের মধ্যে আরও দ্রুত এবং ব্যাপক বিস্তার লাভ করে।

১৯৭০-এর ১লা জানুয়ারি প্রেসিডেন্ট জেনারেল ইয়াহিয়া খাঁন দেশে সাধারণ নির্বাচনের ঘোষণা দিয়ে সীমিত আকারের ঘরোয়া রাজনৈতিক কর্মকান্ডের অনুমতি প্রদান করেন। রাজনৈতিক নেতাদের এ সময়ে ঘরোয়া বৈঠক ও বিভিন্ন মেরুকরণের পাশাপাশি ছাত্র সমাজ জড়িয়ে পড়ে নতুন আর একটি আন্দোলনে- 'পাকিস্তান দেশ ও কৃষ্টি বাতিলের আন্দোলন'।

স্লোগানে স্লোগানে মুখরিত সেই দিনগুলোর কথা

১৯৬৯মানেই স্লোগানে স্লোগানে মুখরিত উত্তাল রাজপথ। তখন প্রতিদিন রাজপথ আমাদেরকে ডাক দিত, ঘর থেকে বের হয়ে মিশে যেতাম রাজপথের মিছিলে। সে সময়ে ১১-দফার সবকয়টি দলের (ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ) কর্মীদের মধ্যে একটা ঠান্ডা লড়াই ছিল জনতার আন্দোলনকে নিজেদের আদর্শের দিকে নিয়ে দল ভারি করার। বাইরে থেকে দেখতে সবাই আমরা এক, ছাত্র সংগ্রম পরিষদের সদস্য, স্লোগান, মিছিল, মিটিংএ খুব একটা আলাদা করে বুঝার মতো কিছু নেই। কিন্তু তার মধ্যেও একটা সুক্ষ্ম পার্টি লাইন ছিল, দলীয় ভাবে জনগণকে নিজেদের দিকে টেনে পাল্লা ভারি করার একটা চেষ্টা ছিল সব দলের কর্মীদের মধ্যে। এ বিষয়ে সাংগঠনিক বিশালতা ছাড়াও জাতীয়তাবাদী সংগঠন হিসেবে আমাদের একটা বাড়তি সুবধা ছিল অন্য দলগুলোর চেয়ে। সুবিধাটি এই যে তৎকালে আমাদের জাতীয়তাবাদী স্লোগান এবং বক্তব্য সরাসরি জনগণের গভীরে পৌঁছে যেত এবং তখনকার দিনের বামপন্থীরা আমাদের এই জাতীয়তাবাদী স্লোগান এবং বক্তব্য একেবারেই পছন্দ করতেন না। এমনকি তারা এ ধরনের স্লোগানে বিরক্ত হয়ে দূরে সরে থাকতেন। এই সুযোগটিকে কাজে লাগিয়ে আমরা মিশে গিয়েছিলাম জনগণের সাথে, পৌঁছে গিয়েছিলাম তাদের হৃদয়ের গভীরে। পরবর্তীতে দেশের প্রায় সব স্কুল, কলেজ ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র সংসদ নির্বাচনে আমাদের (ছাত্রলীগের) একচেটিয়া সাফল্যই ছিল এর প্রমাণ।

যাহোক, তখনকার দিনে আমাদের নিজস্ব স্লোগানগুলোর মধ্যে ছিল 'জয় বাংলা', 'জাগো জাগো - বাঙালি জাগো', 'তোমার আমার ঠিকানা - পদ্মা.মেঘনা.যমুনা', 'জেলের তালা ভাঙ্গব - শেখ মুজিবকে আনব' ইত্যাদি। '৬৯-এর ঐ সময়ে 'জয় বাংলা' স্লোগানটি জনপ্রিয়তা পাওয়ার আগ পর্যন্ত সবচেয়ে জনপ্রিয় ছিল ভাসানীপন্থীদের 'জ্বালো জ্বালো - আগুন জ্বালো' এই স্লোগানটি। স্লোগানটির মধ্যে একটি ছন্দময় বলিষ্ঠতা থাকায় আমরা দেখলাম মানুষ এটিকে দারুণভাবে গ্রহণ করেছে। কিন্তু ওদের আন্তর্জাতিক স্লোগানগুলো কোনোটাই তেমন ভাবে গ্রহণযোগ্য হচ্ছিল না। আমরা এই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে স্লোগানটি ধরে নিয়ে এর সাথে জুড়ে দিলাম আমাদের নিজস্ব স্লোগানগুলো। আমাদের স্লোগানগুলো জাতীয়তাবাদী ভাবধারার হওয়ায় ওদের পক্ষে নীতিগত কারণে এই স্লোগানগুলো দেওয়া সম্ভব ছিল না। সুতরাং দিনে দিনে সময়ের গতিময়তায় ওদের এই জনপ্রিয় স্লোগানটি পুরোপুরিই আমাদের হয়ে যায়। এ নিয়ে অবশ্য আমাদেরকে নিজেদের মধ্যেই কম ঝামেলা পোহাতে হয়নি। দলের এক অংশ তখন আমাদেরকে 'অতিবিপ্লবী' আখ্যা দিয়েছিলেন। 'হাইকমান্ডের' কাছে অনেক অভিযোগও হয়েছে এসব নিয়ে। কিন্তু বাঁধ ভাঙ্গা স্রোত যেমনি কূল ছাপিয়ে এসব আবর্জনা ভাসিয়ে নিয়ে যায় তেমনি আমাদের

অক্লান্ত পরিশ্রম, সাংগঠনিক দক্ষতা ও কতৃত্ব সব অভিযোগ, পিছুটান ভাসিয়ে নিয়ে গেছে চূড়ান্ত লক্ষ্য স্বাধীনতার দিকে। তখনকার দিনে আমাদের তারুণ্যের স্বপ্ন আর লক্ষ্য ছিল শুধু একটাই -'স্বাধীনতা'। সেই স্বপ্ন নিয়েই আমরা মিছিলে মিছিলে হেটে বেড়াতাম, স্লোগানে স্লোগানে ছড়িয়ে দিতাম সেই স্বপ্ন - সেই আহ্বান।

১৯৭০-এ এসে আমাদের আকাঙ্খার সাথে তাল মিলিয়ে পুরনো স্লোগানের সঙ্গে সংযোজিত হল নতুন স্লোগান 'জহুরের রক্ত - স্বাধীনতার মন্ত্র', 'সূর্য সেনের রক্ত - স্বাধীনতার মন্ত্র', 'বীর বাঙ্গালি অস্ত্র ধর বাংলাদেশ স্বাধীন কর", 'পিন্ডি না ঢাকা - ঢাকা ঢাকা' ইত্যাদি সরাসরি স্বাধীনতার কথা। এখনও স্মৃতির মণিকোঠায় ধ্বনিত হয় আমাদের গোলাম ফারুখের গলায় ভরাট-ছন্দময় সুরে আবেগজড়িত আহ্বান 'জাগো জাগো - বাঙালি জাগো' কখনও ধীর লয়ে আবার কখনও মার্চের তালে। তখন এ সব স্লোগানই ছিল আমাদের যৌবনের সংগীত, কর্মে প্রেরণার উৎস। সে সময়ে প্রায়ই যখন আমরা ইকবাল হল অথবা বলাকা ভবনের ছাত্রলীগ অফিস থেকে অনেক রাতে সাংগঠনিক কাজ শেষ করে দল বেধে বাড়ির দিকে হাঁটা পথে রওয়না দিতাম তখন পথের ক্লান্তি ভুলে নিজেদেরকে উজ্জীবিত করার জন্যে সুর করে সবাই স্লোগান ধরতাম 'জাগো জাগো - বাঙালী জাগো', 'জাগ জাগ জাগরে জাগ - বাঙালি জাগরে জাগ' ইত্যাদ বলে। আর রাস্তার উপর অথবা বাড়ির মধ্য থেকে অনেকেই সে সময়ে 'জয় বাংলা' বলে আমাদেরকে উৎসাহ দিতেন।

তখনকার দিনগুলোতে আমরা ঢাকা শহরের সমমনা কর্মীরা সমস্ত দিনের কাজ শেষ করে সন্ধ্যায় বা রাতে ইকবাল হলের (বর্তমানে সার্জেন্ট জহুরুল হক হল) মাঠে অথবা ক্যান্টিনে মিলিত হতাম সেই দিনকার কার্যাবলী পর্যালোচনার জন্যে এবং আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে জেনে নিতাম পরদিন কোথায় কী ধরনের কর্মসূচি আছে। সেই সাথে নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আলাপ করে কে কোথায় যাবে এবং কী ধরনের বক্তব্য দেওয়া হবে সেসবও ঠিক করে নেওয়া হতো। তখন কোনও বড় মিছিল বা মিটিং থাকলে আমরা ৫/৬জনের ছোট ছোট টিম করে নিতাম যাতে পুরো মিছিল বা মিটিং এর মধ্যে ছড়িয়ে থাকা যায় এবং আমাদের স্লোগানগুলোকে সকলের কাছে পৌছে দেওয়া যায়। ঢাকা শহরে আমাদের স্কুল, কলেজ এবং এলাকাভিত্তিক এ ধরনের একনিষ্ট, সার্বক্ষণিক কর্মীবাহিনীর টিম ছিল প্রায় ১০/১২টি। জগন্নাথ কলেজ থেকে সে সময়ে ছিলেন- মফিজুর রহমান খান (ছাত্রলীগ ঢাকা নগর শাখার সভাপতি ১৯৬৯-৭০), আজিজুল হক চৌধুরী কাওসার, শেখ আতাউর রহমান, কাজী জাহাংগীর আমীর, নজরুল ইসলাম ('৭১-এর মুক্তিযুদ্ধে শহীদ), ওয়ালী আহমেদ পাটোয়ারি, আব্দুল হক, ফজলুর রহমান ভুলু, পনির, জিন্নাহ, সাইফুর রহমান, মোয়াজ্জেম হোসেন ঢালি, মাইদুল ইসলাম, মমতাজ হোসেন, নুরু মিয়া, আলতাফ হেসেন, একরামুল হক প্রমুখ। কায়েদে আযম কলেজ (বর্তমানে সোহরাওয়ার্দী কলেজ) থেকে ইব্রাহীম,

মনিরুল হক (ছাত্রলীগ ঢাকা নগর শাখার সভাপতি ১৯৭০-৭২) আব্দুল মতিন, হারুন-অর রশিদ, আনোয়ার হোসেন বাবুল, শামসুল হক, দেলোয়ার প্রমুখ। সলিমুল্লাহ ডিগ্রি কলেজ থেকে আনোয়ার হোসেন ভূঁইয়া (ছাত্রলীগ ঢাকা নগর শাখার সহ-সভাপতি ১৯৬৯-৭০), জহুরুল বাশার, শহিদুল ইসলাম দুলাল প্রমুখ। যাত্রাবাড়ি থেকে খালেকুজ্জামান চৌধুরী। নটরডেম কলেজে একমাত্র সক্রিয় কর্মী ছিলেন নূরন্নবী (যদিও সক্রিয় ছাত্র-রাজনীতি করার কারণে তাকে কলেজ কতৃপক্ষ বের করে দেন)। টিঅ্যান্ডটি কলেজ থেকে তৌহিদুল ইসলাম, হারুনর রশিদ, সেলিম ভূঁইয়া, আবুল কালাম আজাদ, নাজমুল হাসান জংগি, ফজলুর রহমান বাবুল, পেয়ারু, দুদু, আব্দুস সালাম প্রমুখ। সিদ্ধেশ্বরী কলেজ থেকে এস.এম.কবির। আবুজর গিফারি কলেজ থেকে আল-ফারুক, শাহাবউদ্দিন। জিন্নাহ কলেজ (বর্তমানে তিতুমীর কলেজ) থেকে সিরাজ, কুতুবউদ্দিন, হেলাল, চন্দন, কামাল উদ্দিন প্রমুখ। সিটি নাইট কলেজ থেকে আব্দুস সহিদ খান সেন্টু , রুবেল প্রমুখ। ঢাকা কলেজ থেকে নিজাম উদ্দিন সরকার, রেজাউল হক চৌধুরী মুশতাক (কলেজ শাখার সাধারণ সম্পাদক এবং ছাত্রলীগ ঢাকা নগর শাখার সাধারণ সম্পাদক ১৯৬৯-৭০), তাজুল ইসলাম, ইমাম আবু জাহিদ, শেখ কামাল, আব্দুল আজিজ, সৈয়দ শাহেদ রেজা, কামরুল ইসলাম, নজরুল ইসলাম ('৭১-এর মুক্তিযুদ্ধে শহীদ), নূরুল ইসলাম আব্বাস, রেজাউল, রফিক, মোশারফ হোসেন খান, বদরুদ্দিন আহমেদ, মোহাম্মদ মহসিন, আব্বাস, নুরুল ইসলাম (নুরু), ওবায়েদুল কাদের, মোক্তাদির চৌধুরী মাসুদ।

এ ছাড়া '৬৯-এর গণ-আন্দোলনের সময়ে, দ্রুত পরিবর্তনশীল পরিস্হিতির কারণে, তাৎক্ষণিক যোগাযোগ ও বিভিন্ন কমসূচি পালনের জন্যে কর্মী যোগান দিতে ঢাকা শহরকে ৫/৬টি অংশে ভাগ করে কাজ করা হয় ও কয়েকটি আঞ্চলিক কমিটি গঠন করা হয়। মিটিং-মিছিল করা, পোস্টার লেখা ও লাগানো, চিকা মারা (দেয়ালে লেখা) এ ধরনের প্রতিটি কাজে এ সব কমিটি ছিল স্বয়ংসম্পূর্ণ। অক্লান্ত পরিশ্রম, সাংগঠনিক দক্ষতা ও নিষ্ঠার সঙ্গে এসব এলাকায় কাজ করে গেছেন দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলে মেসবাহউদ্দীন আহমেদ (যদিও সে সময়ে তিনি সিরাজুল আলম খানের নির্দেশে পোস্তাগোলা এলাকায় শ্রমিক আন্দোলনের সাথে যুক্ত ছিলেন), শেখ আতাউর রহমান (সহ-সভাপতি, ঢাকা নগর শাখা ১৯৭০-৭২), দেলোয়ার, ফজলুর রহমান ভুলু, খালেকুজ্জামান চৌধুরী, আব্দুল আজিজ, হাফিজ, আবু বকর ছিদ্দিক প্রমুখ। টি এ্যান্ড টি কলেজ মতিঝিল কলোনি ও আরামবাগ এলাকায় সেলিম ভূঁইয়া (সহ-সভাপতি, ঢাকা নগর শাখা ১৯৭০-৭২); নাজমুল হাসান জংগি, হারুনর রশিদ, ফজলুর রহমান বাবুল, আবুল কালাম আজাদ, পেয়ারু, সিরাজুল ইসলাম দুদু, সালাউদ্দিন বুলবুল, আব্দুস সালাম প্রমুখ। উত্তর অঞ্চলে আজিজুল হক চৌধুরী কাওসার (সাংগঠনিক সম্পাদক, ঢাকা নগর শাখা ১৯৭০-৭২), আল ফারুক,

শাহাবউদ্দিন (দফতর সম্পাদক, ঢাকা নগর শাখা ১৯৭০-৭২), মীর হোসেন আক্তার, লাবলু, নুরুলআমিন, হীরু, টুলু, মহিবুল ইসলাম ইদু প্রমুখ। মীরপুর-মোহাম্মদপুর এলাকায় আব্দুল বাতেন চৌধুরী। মহাখালি, গুলশান, বনানী এলাকায় তিতুমির কলেজের ছাত্ররা ছাড়াও মহাখালী চেয়ারম্যান বাড়ির আব্বাস, গুলশানে মোশারফ হোসেন খান। তেজগাঁও কলেজ, সিটি নাইট কলেজ, ঢাকা কলেজ, ইডেন ও বদরুন্নেসা গার্লস কলেজে এবং ধানমন্ডি, লালমাটিয়া এলাকায় শেখ কামাল ও তার সহযোগীবৃন্দ, আব্দুল আজিজ, সৈয়দ শাহেদ রেজা, তাজুল ইসলাম, সেন্টু, রুবেল প্রমুখ। আজিমপুর, পিলখানা থেকে কমরেড রফিক, মফিজ, নূরুল করিম জিন্নাহ, শামিম রাব্বানী, শওকত চৌধুরী প্রমুখ।

এছাড়া সে সময়ের কর্মীদের মধ্যে বিশেষভাবে যার নাম উল্লেযোগ্য, জগন্নাথ কলেজের ছাত্র এবং ঢাকা শহর উত্তারাঞ্চলের (মালিবাগ) বাসিন্দা আজিজুল হক চৌধুরী কাওসার। তিনি শুধুমাত্র ঢাকা শহর শাখার সাংগঠনিক সম্পাদক হিসেবে নয় বরং দলের একজন, সার্বক্ষণিক এবং অক্লান্ত পরিশ্রমী কর্মী হিসাবে সমগ্র ঢাকা শহরের স্কুল, কলেজ ও আঞ্চলিক শাখাগুলোতে সুদৃঢ় যোগাযোগ রক্ষা করে যেতেন। স্বাধীনতার প্রতি তাঁর আপোসহীন প্রত্যয় এবং আকর্ষনীয় চারিত্রিক গুনাবলির জন্য দলের সকল স্তরের নেতা, কর্মী সাথেই ছিল তাঁর অত্যন্ত হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্ক।

সর্বোপরি, সাংগঠনিক দিক থেকে ঢাকা শহরের বিশেষ গুরুত্ব থাকায় ছাত্রলীগ কেন্দ্রীয় কমিটির তোফায়েল আহমেদ, আ স ম আব্দুর রব, শাজাহান সিরাজ, স্বপন কুমার চৌধুরী, মনিরুল হক চৌধুরী, আ ফ ম মাহবুবুল হক, এম.এ. রশিদ, মনিরুল ইসলাম (পরবর্তীতে ডলার মনি নামে পরিচিত), একরামুল হক, বদিউল আলম, ইসমত কাদির গামা, রায়হান ফেরদৌস মধু এবং ১৯৭০ সনের প্রথম দিকে জেল থেকে ছাড়া পাওয়ার পর নূরে আলম সিদ্দিকি, শেখ শহিদুল ইসলাম। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে জীনাত আলি, মোয়াজ্জেম হোসেন খান মজলিশ, কামালউদ্দিন আহমেদ, আফতাবউদ্দিন আহমেদ, সাইফুল গনি চৌধুরী, গোলজার। প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইউসুফ সালাউদ্দিন, মইনুল ইসলাম আজাদ, আব্দুল্লা সানী, ইব্রাহীম, শরীফ নূরুল আম্বিয়া, হাসানুল হক ইনু, নিখিল, আসাদ, কাসেমসহ আরও অনেকে। ঢাকা মেডিকেল কলেজ থেকে আলি হাফিজ খান সেলিম, মফিজ। এরা প্রত্যেকে কেন্দ্রীয় কর্মসূচি ছাড়াও স্কুল, কলেজ ও আঞ্চলিক শাখার মিটিং - মিছিল, ধর্মঘট এবং ঘরোয়া বৈঠকসহ বিভিন্ন কর্মসূচিতে নিয়মিত অংশগ্রহণ করতেন এবং কর্মীদের সঙ্গে মত বিনিময় করতেন।

আমাদের সংগঠনে সে সময়ে সবচেয়ে দুর্বল অংশ ছিল ছাত্রী শাখা, তা-ই এই বিষয়টি সরাসরি কেন্দ্রের তত্ত্বাবধানে এনে, মজহারুল হক টুলুর মাধ্যমে সংগঠিত

করার দিকে বিশেষ নজর দেওয়া হয়। রাফিয়া আক্তার ডলি, মমতাজ বেগম, শামসুন্নাহার ইকু, রীনা, সাকি, শিরিন আখতার, রওশান জাহান সাথী, বকুল (মোস্তফা), ফোরকান, মোরশেদা করিম আলো (আহমেদ), খালেদা, রেহানা, রাবেয়া হায়দার (সিরাজ), লাইলী, বেবি (সিদ্ধেশ্বরী কলেজ), শেফালী প্রমুখ এরা স্ব-স্ব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ছাড়াও অন্যান্য স্কুল-কলেজ এবং আঞ্চলিক শাখায় গিয়ে অক্লান্ত পরিশ্রম করে অল্প দিনের মধ্যে স্কুল-কলেজের ছাত্রীদেরকে ছাত্রলীগের পতাকাতলে নিয়ে আসেন। এদেরই নেতৃত্বে মহিলাদের একটি বিশাল অংশ পরবর্তীতে সরাসরি মুক্তি যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন।

সে সময়ে সংগঠনের আর একটি বিশেষ দিকের কথা উল্লেখ করতেই হয়, সেটি হল আমরা যারা দলের মধ্যে স্বাধীনতাপন্থী হিসেবে পরিচিত ছিলাম, তারা সবাই নেতৃত্বের জ্যেষ্ঠতা বা "র‍্যাংক অ্যান্ড ফাইল" কঠোরভাবে মেনে চলতাম। আমাদের সঙ্গে হাই কমান্ডের যোগাযোগের সূত্র ছিলেন কাজী আরেফ আহমেদ এবং মনিরুল ইসলাম (মার্শাল মনি)[৫] তাদের কথাকেই আমরা হাই কমান্ডের নির্দেশ বলে মেনে নিতাম। পরবর্তীতে স্বাধীনতা যুদ্ধে মিলিটারি ট্রেনিং এর সময় বুঝেছিলাম এই "র‍্যাংক অ্যান্ড ফাইল" মেনে চলার গুরুত্ব। আমার মনে হয় এই "র‍্যাংক অ্যান্ড ফাইল"- এর চেইন অফ কমান্ড মেনে চলার কারণেই সম্ভব হয়েছিল অল্পসময়ের মধ্যে দেশব্যাপি 'জাসদ' এর মত বড় একটি বিপ্লবী সংগঠন গড়ে তোলা।

সেই সব ঘটনাবহুল দিনের অজস্র ঘটনার মধ্যেও কিছু কিছু ঘটনা ছিল যা এখনও স্মৃতিকে গভীর ভাবে নাড়া দেয়। ১৯৬৯-এর ১৫ই ফেব্রুয়ারি আগরতলা মামলার অন্যতম আসামি ফ্লাইট সার্জেন্ট জহুরুল হককে বিচারাধীন অবস্থায় ঢাকা সেনানিবাসে গুলি করে হত্যা করা হয়। এই হত্যা কান্ডের পরপরই সারা দেশ প্রচন্ড বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। দৈনিক পাকিস্তান, পি.আই.ডি. কার্যালয়সহ বিভিন্ন সরকারি স্থাপনা, মন্ত্রীদের বাড়ি, গাড়ি ইত্যাদি জনগণ আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে দেয়। মিছিল, মিটিং, পোস্টার, লিফলেট এবং দেয়াল লিখনের মাধ্যমে আমরা আওয়াজ তুলি 'জহুরের রক্ত - স্বাধীনতার মন্ত্র'। গণরোষে বেসামাল তৎকালিন পাকিস্তানি শাসকবৃন্দ ১৮ই ফেব্রুয়ারি 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা' প্রত্যাহার ঘোষণা করেন এবং সংকট সমাধানের লক্ষ্যে শেখ মুজিবসহ অন্যান্য বিরোধী দলীয় নেতাদেরকে গোল টেবিল বৈঠকে বসার আহ্বান জানান হয়। আমরা প্রতিদিনই অপেক্ষায় আছি যেকোনও মুহূর্তে শেখ মুজিবুর রহমানের মুক্তির সংবাদ শোনার।

---

[৫] ছাত্রলীগের নেতৃত্ব পর্যায়ে এ সময়ে একসাথে অনেক 'মনি'র সমাবেশ ঘটায় নির্দিষ্ট করে বুঝানোর জন্য একেক জনের ন.মের আগে একেকটি বিশেষণ ব্যবহার করা হতো।

এমনি একটি উত্তেজনাকর সময় ফেব্রুয়ারি মাসের ১৯ অথবা ২০ তারিখ ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের পক্ষ থেকে ঢাকা শহরে এক বিশাল মিছিল বের করা হয়েছিল। দুই লাইনের বিশাল সেই মিছিলটি শৃঙ্খলা ও বিশালতার বিবেচনায় সম্ভবত আজও অনন্য। যাহোক, সেই মিছিলে আমরা পূর্ব পরিকল্পনা মতো ছড়িয়ে ছিলাম এবং ভাগ ভাগ করে দুই লাইনের মাঝ খান দিয়ে হেটে স্লোগান দিচ্ছিলাম। আমার পরেই ছিল শেখ কামাল তার গ্রুপ নিয়ে। মাথায় রুমাল বেঁধে শেখ কামাল বেশ দৃঢ়তার সঙ্গে তাঁর নিজস্ব ভঙ্গিতে আগে পিছে দুলে-দুলে স্লোগান দিচ্ছিল আর লোকজনও তাঁর স্লোগানে ভালোই সাড়া দিচ্ছিল। কিন্তু কিছুক্ষণ পরে লক্ষ্য করলাম লোকজন আস্তে আস্তে শেখ কামালের কাছ থেকে সরে যাচ্ছে। বেশ কিছু লোক এগিয়ে আমার দিকে চলে এসেছে আবার কিছু লোক পিছিয়ে গিয়ে সৈয়দ শাহেদ রেজা এবং নজরুল ইসলাম (ঢাকা কলেজ) যেখানে স্লোগান দিচ্ছিল সেদিকে চলে গেছে। বিষয়টা চোখে পড়ার মতো, আমি আমার স্লোগান সহকর্মী শাহাবউদ্দিনকে ধরিয়ে দিয়ে এগিয়ে আসা একজনকে জিজ্ঞেস করলাম তার সামনে এগিয়ে আসার কারণ। লোকটি কোনোরকম দ্বিধা না করে সরাসরি শেখ কামালের দিকে আঙ্গুল উঁচিয়ে বেশ জোরে প্রচন্ড ঝাঁঝের গলায় বলল, "ওই বেটা নিশ্চয় পাকিস্তানিদের দালাল, সব স্লোগান দেয় কিন্তু শেখ মুজিবের মুক্তির স্লোগান দেয় না।" আমি হতবাক, কামালও ওইভাবে ওর দিকে আঙ্গুল উঁচিয়ে জোরে বলায় থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছে। কোনোরকমে নিজেকে সামলে নিয়ে বললাম যার দিকে আঙ্গুল দেখাচ্ছেন সে শেখ মুজিবের বড় ছেলে, শেখ কামাল, সেজন্যেই বাবার মুক্তির স্লোগান নিজে দিতে পারছে না। লোকটি কতক্ষণ শেখ কামালের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থেকে এক দৌড়ে গিয়ে সোজা শেখ কামালকে ঘাড়ে তুলে নিল, তারপর শুধু একই স্লোগান 'তোমার নেতা আমার নেতা, শেখ মুজিব - শেখ মুজিব', 'জেলের তালা ভাংবো শেখ মুজিবকে আনব', 'শেখ মুজিবের মুক্তি চাই - মুক্তি চাই'। সেদিন মিছিলের অন্যান্য জায়গায় দুই লাইন রাখা সম্ভব হলেও শেখ কামালের স্থানে আর সেটি রাখা সম্ভব হয়নি। আর দেখলাম সদা প্রাণচঞ্চল শেখ কামালকে, একটু আগেও যে নেচে নেচে হেলে দুলে স্লোগান দিচ্ছিল, এখন বাকহারা হয়ে অশ্রুসিক্ত নয়নে নীরবে হেটে চলছে। হয়ত সে মুহূর্তে সাধারণ মানুষের ভালোবাসার অনুভূতি তার হৃদয়কে গভীর ভাবে আপ্লুত করে থাকবে।

খসরু, মন্টু, সেলিমের হুলিয়া নিতে হবে তুলিয়া

১৯৬৯-এর আন্দোলন শুরুর সময় প্রথমদিকে সরকারের পেটোয়া বাহিনী এন.এস.এফ'র সদস্যরা কিছুটা বাধা দেওয়ার চেষ্টা করলেও পরবর্তীতে গণজাগরণে ভীত হয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন হলে এন.এস.এফ. এর মূল ক্যাডাররা উল্টোভাবে নিজেরাই নিজেদের পাতিগুলোকে সবার সামনে মেরে ভাল সাজার চেষ্টা করেছে। এ সময়ে নিজেদের লোকের হাতেই এস.এম. হলে একদিন এন.এস.এফ.-এর কুখ্যাত গুন্ডা পাচপাত্তু খুন হয়। পাচপাত্তু খুন হওয়ার সাথে সাথে পরিস্থিতি সম্পূর্ন পাল্টে যায়, পাড়ায় পাড়ায় যে সব তরুণ মাস্তানের দল এন.এস.এফ-এর অথবা সরকারের সমর্থক ছিল তারাও অবস্হা বুঝে দ্রুত নিজেদের ভোল পাল্টে ফেলে। এর মধ্যে একদিন এন.এস.এফ.-এর আর এক কুখ্যাত গুন্ডা খোকার লাশ পাওয়া গেল রেসকোর্স ময়দানে। এরপর সরকার সক্রিয় হয়ে উঠে, ছাত্রলীগের কামরুল আনাম খসরু, মোস্ত ফা মহসিন মন্টু এবং সেলিমের উপর হুলিয়া জারি করা হয়। এরা আন্দোলন শুরু হওয়ার সময় থেকে রাতদিন ছাত্রলীগের নেতা কর্মীদেরকে এবং আমাদের মিছিলগুলোকে অভিবাবকের মতো পাহারা দিতেন এবং আমাদের সাথে স্বাধীনতার গোপন বৈঠক গুলোতেও গভীর আগ্রহ নিয়ে অংশগ্রহণ করতেন।[৬] আন্দোলনের প্রথম দিকে যখন সাধারণ ছাত্রদের অংশগ্রহণ ছিল খুবই কম সে সময়ে বিশেষ করে বিশ্ববিদ্যালয় এলাকাগুলোতে আমাদের মিছিলগুলোতে এন.এস.এফ.-এর ভাড়াটিয়া গুন্ডারা যাতে আক্রমণ করতে না পারে সে জন্যে প্রতিটি মিছিলেরই অগ্রভাগে ফিরু , খসরু, মন্টু, সেলিম, মহিউদ্দিন, ফজলুর রহমান ফেন্টোমাস উপস্হিত থাকতেন।

---

[৬] কামরুল আনাম খসরু, মোস্তফা মহসিন মন্টু, সেলিম, রেজা শাহজাহান, মহিউদ্দিন আহমেদ প্রত্যেকেই বি.এল.এফ.-এর (মুজিব বাহিনী) ট্রেনিং নিয়ে দেশে ফিরে এসে অত্যন্ত সাহসি কিছু সামরিক অপারেশন করেন। এদের মধ্যে মোস্তফা মহসিন মন্টু এবং কামরুল আনাম খসরু ঢাকায় মুজিব বাহিনীর দুই অংশের দায়িত্বে ছিলেন। জনাব মোস্তফা মহসিন মন্টু ঢাকা পশ্চিমাঞ্চলের দায়িত্বে ছিলেন এবং তাঁর মূল ঘাঁটি ছিল কেরানিগঞ্জে। জনাব কামরুল আনাম খসরু ঢাকা পূর্বাঞ্চলের দায়িত্বে ছিলেন এবং তাঁর মূল ঘাঁটি ছিল ডেমরা এলাকায়। জনাব সেলিম পার্বত্য-চট্টগ্রামে বিশেষ অভিযানে অংশগ্রহণ করেন এবং জনাব রেজা শাহজাহান ফরিদপুরের ভাংগা উপজেলার দায়িত্বে ছিলেন। কামরুল আনাম খসরু ঢাকায় ইন্টারকন্টিনেন্টাল হোটেলে বোমা হামলাসহ ঢাকা শহরের মধ্যে বেশ কিছু দুঃসাহসী অভিযান পরিচালনা করেন। জনাব মহিউদ্দিন 'বঙ্গবন্ধু'র ব্যক্তিগত নিরাপত্তার বিশেষ দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন। জনাব ফজলুর রহমান ফেন্টোমাস মুক্তিবাহিনী ট্রেনিং নিয়ে প্রবাসী সরকারের প্রধানমন্ত্রী জনাব তাজউদ্দিনের নিরাপত্তার দায়িত্বে ছিলেন।

এ ছাড়া সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ১৯৭০ সনে ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় সম্মেলনে তোফায়েল আহমেদ যখন সভাপতি পদের জন্য ছাত্রলীগের সব স্তরের নেতা ও কর্মীদের পছন্দের একক প্রার্থী ছিলেন সে সময়ে সদ্য কারামুক্ত ছাত্রনেতা নূরে আলম সিদ্দিকি এবং আল মুজাহেদি এই একই পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতার কথা ঘোষণা করেন। সম্মেলনের কয়েকদিন আগে অত্যন্ত সুচতুর ভাবে গুজব ছড়িয়ে দেওয়া হয় যে সম্মেলনের দিন ইঞ্জিনিয়ারিং ইনস্টিটিউটের সম্মেলন স্হলে প্রচন্ড গোলমাল হবে এবং গোলমাল করার জন্যে ঢাকার 'রুচিরা গ্রুপ' (কায়েদে আযম কলেজের পাশে 'রুচিরা' হোটেলকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠা একটি গ্রুপ)সহ একাধিক গ্রুপকে ভাড়া করা হয়েছে বলেও শোনা যায়। কিন্তু এই গুজবই প্রতিপক্ষের জন্যে বুমেরাং হয়ে দেখা দেয়, গুজব রটনাকারীদের আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী ভয়ে উপস্হিতি কম হওয়ার বদলে বরং সমগ্র ইঞ্জিনিয়ারিং ইনস্টিটিউট চত্বর, রমনা রেস্তোরা এলাকা এমনকি রেসকোর্স ময়দান (সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) পর্যন্ত ছাত্রলীগ কর্মীদের আগমনে ভরে উঠে। খসরু, মন্টু, সেলিম, মহিউদ্দিন,ফজলুর রহমান ফেন্টোমাস ও রেজা শাহজাহান সমগ্র সম্মেলন স্হল ঘুরে ঘুরে পাহারা দিতে থাকে। অবস্হা বেগতিক দেখে সভাপতি পদপ্রার্থী আল মুজাহেদি সম্মেলন স্হলে উপস্হিত হননি এবং সম্মেলনে তাঁর নামের প্রস্তাবকও কেউ ছিলো না। ছাত্রলীগের তরুণ প্রজন্মের মধ্যে তোফায়েল আহমেদে এসময়ে খুবই জনপ্রিয় ছিলেন তাই সাধারণ কাউন্সিলাররা তোফায়েল আহমেদকে সভাপতি ও নূরে আলম সিদ্দিকিকে সাধারণ সম্পাদক করার প্রস্তাব করেন। কিন্তু এই প্রস্তাবে নূরে আলম সিদ্দিকির আপত্তি থাকায় তোফায়েল আহমেদকে সভাপতি ও আ স ম আব্দুর রবকে সাধারণ সম্পাদক করে অত্যন্ত সুন্দর ও জমজমাট ভাবে ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় সম্মেলন সমাপ্ত হয়। আল মুজাহেদি তাঁর উদ্যোগে ব্যর্থ হয়ে এ সময়ে কিশোরগঞ্জের আব্দুল মান্নান খানকে সাধারণ সম্পাদক এবং নিজে সভাপতি হয়ে 'বাংলা ছাত্রলীগ' গঠন করেন। জনাব নূরে আলম সিদ্দিকিকে পরবর্তি বছরে ছাত্রলীগের সভাপতি নির্বাচিত করা হয়।

১৯৬৯-এর গণ-আন্দোলনে ছাত্র নেতাদের মধ্যে জনাব তোফায়েল আহমেদ একচ্ছত্র নেতা হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। অথচ আন্দোলনের প্রাথমিক পর্যায়েও অন্যান্য সংগঠনের ছাত্র- নেতাদের তুলনায় জনসভায় বক্তৃতা দেওয়ার অভ্যাস তাঁর বলতে গেলে একেবারেই ছিল না। জনাব সিরাজুল আলম খান ইকবাল হলের মাঠে আমাদেরকে সামনে বসিয়ে তোফায়েল আহমেদের বক্তৃতা দেওয়ার অভ্যাস গড়ে তুলেন এবং একজন ভালো ছাত্রের মতো জনাব তোফায়েল আহমেদ অত্যন্ত দ্রুত বক্তৃতা অনুশীলন আয়ত্ব করে নেন। মাত্র কয়েকদিনের অভ্যাসেই জনাব তোফায়েল আহমেদ একজন সুবক্তা হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন। তখন আমরা সাধারণত বিভিন্ন জনসভায় লক্ষ্য করতাম যে সভাপতির ভাষণের সময় হলেই লোকজন আস্তে

আস্তে সভাস্থল থেকে সরে যেতে থাকত, সেকারণে '৬৯-এর প্রথম দিকের দিনগুলোতে জনাব তোফায়েল আহমেদ একেকজন বক্তাকে বক্তৃতা দিতে আহ্বান জানানোর ফাঁকে ফাঁকেই তাঁর বক্তৃতা দিয়ে ফেলতেন। কিন্তু ধীরে-ধীরে তাঁর বক্তৃতা মানুষকে আকৃষ্ট করতে থাকে এবং তিনি নিজেই নিজের প্রতি যথেষ্ট আস্থাবান হয়ে উঠেন, এরপর পরিস্হিতি এমন দাঁড়ায় যে, মানুষ তাঁর বক্তৃতা শোনার জন্যেই সভার শেষ পর্যন্ত আগ্রহ সহকারে বসে থাকত।

১৯৬৯-৭১ সময়ের রাজনৈতিক সংস্কৃতি

১৯৬৯ থেকে '৭১-এর রাজনৈতিক নেতা-কর্মীরা প্রত্যেকেই এক অভিন্ন সংগ্রামী সংস্কৃতি বা ধারার মধ্যে বেড়ে উঠেছে বলে আমার বিশ্বাস। বিশ্বের বিভিন্ন বিপ্লবী নেতাদের জীবনী অনুকরণ করে সে সময়কার নেতা-কর্মী প্রত্যেকের মধ্যেই লক্ষণীয় ছিল চারিত্রিক দৃঢ়তা এবং আত্মসম্মানবোধ। দলের কাজে নিজেদের যাতায়াত, খাওয়া অথবা হাত খরচের জন্যে কারও কাছে টাকা চাওয়া অথবা কোনও কর্মীকে টাকা দেওয়া এর কোনোটাই আমরা ভাবতেও পারতাম না। বরং ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস পড়ে আমরা এ কথাই ভাবতাম কখন না নেতারা দলের প্রয়োজনে আমাদেরকে বাসা থেকে মায়ের গয়না অথবা টাকা পয়সা এনে দিতে বলেন। যদিও কখনও এরকম কোনও পরিস্হিতির সৃষ্টি হয়নি। তথাপি আমরা নিউক্লিয়াস গুলোর গোপন সভায় কর্মীদেরকে এরকম সম্ভাবনার কথা বলে তাদেরকে মানসিক ভাবে প্রস্তুত করে রাখতাম।

সে সময়ে ২১শে ফেব্রুয়ারি উপলক্ষে ছাত্রলীগের প্রায় প্রতিটি শাখা থেকে একটি করে সংকলন বের করা হতো। এই সংকলনের খরচ মেটানোর জন্যে আমরা বিশেষ করে মতিঝিল এলাকার ব্যাংক এবং বাণিজ্যিক অফিসগুলো থেকে বিজ্ঞাপন সংগ্রহ করতাম। সারা দিন ঘুরে ঘুরে, সম্ভব হলে কোনও পরিচিত লোকের সূত্র ধরে, চলত আমাদের বিজ্ঞাপন সংগ্রহের কাজ। যেদিন আমরা বিজ্ঞাপন সংগ্রহের জন্যে বের হতাম সেদিন দুপুরে আমাদের একেক জনের খাওয়ার বাজেট ছিল ৪আনা (২আনার গরুর মাংস এবং ১আনা করে ২আনায় ২টি নানরুটি)। মতিঝিল এলাকায় সস্তায় দুপুর বেলায় খাওয়ার কাজটি আমরা মতিঝিল থেকে ফকিরাপুল ঢোকার রাস্তার মুখে অবস্থিত 'বাদশা মিঞার হোটেল'-এ সেরে নিতাম।

সংকলনের প্রচ্ছদের জন্যে আমরা শেষ মুহূর্তে গিয়ে হানা দিতাম কামাল ভাইয়ের কাছে (কামাল ভাই সে সময়ে ছাত্রলীগের প্রাক্তন নেতা মজহারুল হক বাকি ভাইয়ের বিজ্ঞাপনী সংস্হার প্রধান আর্টিস্ট ছিলেন)। লম্বা চওড়া হাসি খুসির মানুষটি আমাদেরকে দেখেই চেহারা কৃত্রিম গম্ভীর করে ফেলতেন এবং আগেই 'হবে না' বলে মাথা নাড়তে থাকতেন। আমরাও নিরিহ মুখ করে তাঁর পাশে বসে কতক্ষণ গল্প করার পর খোলস ছেড়ে বেরিয়ে আসত আসল মানুষটি। এরপর আমাদের জন্যে চা, নাস্তা সবই হতো এবং অফিসে কাজের চাপ বেশি হলে প্রয়োজনে বাসায় গিয়ে রাত জেগে আমাদের প্রচ্ছদের কাজ এবং কখনও কখনও স্কুল কলেজের সংসদ নির্বাচনে পোস্টারের কাজও করে দিতেন। সে সময়কার ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় সাহিত্য সম্পাদক নাসিরুল ইসলাম বাচ্চু আমাদেরকে তাঁর লেখা কবিতা দেওয়া ছাড়াও প্রায়ই আমাদের সংকলনের জন্যে সুন্দর-সুন্দর নাম ঠিক করে দিতেন।

সংকলন, পোস্টার, লিফলেটসহ সব ধরনের ছাপার কাজগুলো আমরা সে সময়ে আজিমপুর শেখ সাহেব বাজারের 'লেখা প্রিন্টিং প্রেস' থেকে করাতাম। এর মালিক সুন্দর মিয়া ছিলেন আমাদের পৃষ্ঠপোষক এবং সমর্থক। ছাপার কাজগুলো বাকিতে করে দেওয়া ছাড়াও প্রয়োজনীয় কাগজও নিজেই কিনে দিতেন। বিজ্ঞাপনের বিল সংগ্রহ হওয়ার পর আমরা কাগজের দাম, বাইন্ডারের পারিশ্রমিকসহ ছাপাখানার যাবতীয় বিল শোধ করতাম। আমাদের সঙ্গে এই ছাপাখানার মালিকের ঘনিষ্টতার কারণে ২৫শে মার্চের পর ছাপাখানাটি বিহারী এবং রাজাকাররা মিলে লুটপাট করে জ্বালিয়ে দেয়।

পাড়ায়/এলাকায় যখন পোস্টার লাগানো বা দেয়াল লিখনের দরকার পড়ত আমরা (উত্তারাঞ্চলে) নিজেরা (আজিজুল হক চৌধুরী কাওসার, আল-ফারুখ, শাহাবউদ্দিন) একটা টিম করে অনেক রাতে সেসব কাজ করতাম। মালিবাগ মোড়ে অবস্হিত রাজারবাগ ইউনিয়ন আওয়ামী লীগ অফিস থেকে মহীবুল ইসলাম কার্জন, হাশেম উদ্দিন হায়দার পাহাড়ী, মজনু ভাই, ইঁদু এরা তখন পোস্টার লাগানো বা দেয়াল লিখনে, নিজেরাই আন্তরিক উৎসাহ নিয়ে আমাদেরকে সঙ্গ দিতেন এবং উৎসাহ যোগাতেন। নীতি-আদর্শের প্রতি আমাদের অঙ্গীকার এবং বিশেষত চারিত্রিক দৃঢ়তার কারণে আমরা সে সময়কার প্রতিটি নেতা, কর্মী, যার যার এলাকায়, পাড়ায় বড়দের স্নেহের এবং ছোটদের সম্মানের পাত্র ছিলাম। আমাদের দলের মধ্যে বিশেষ করে যারা স্বাধীনতাপন্থী ছিলাম, তাদের পরস্পরের প্রতি বিশ্বস্ততা ছিল প্রশ্নাতীত। আমাদের কারও কোনও প্রকার কাজের জন্য অন্য কাউকে যেন কষ্ট পেতে না হয় সে বিষয়ে আমরা অত্যন্ত সতর্ক থাকতাম। আমাদের কাজের মধ্য দিয়ে আমরা চারিত্রিক দৃঢ়তা ফুটিয়ে তুলতে চেষ্টা করতাম। সে সময়ে আমরা বেশির ভাগ নেতা কর্মীরাই যার যার এলাকা থেকে পায়ে হেঁটে বলাকা ভবন ছাত্রলীগ অফিস, ইকবাল হল অথবা বিশ্ববিদ্যালয়ের বটতলায় যাতায়াত করতাম।

পাকিস্তান দেশ ও কৃষ্টি বাতিলের আন্দোলন

পাকিস্তানি শাসক চক্র দেরিতে হলেও পূর্ব-পাকিস্তানে তাদের একচেটিয়া শোষণ ও বঞ্চনার ভবিষ্যত পরিণাম বুঝতে পেরে শংকিত হয়ে উঠে এবং মরিয়া হয়ে মগজ ধোলাইয়ের মাধ্যমে আগামী প্রজন্মকে হাত করার জন্যে ১৯৭০ সালের পাঠ্যক্রমে মাধ্যমিক স্কুল পর্যায়ে চালু করে একটি নতুন পাঠ্য বিষয় 'পাকিস্তান দেশ ও কৃষ্টি'। স্কুল ছাত্রদের পক্ষ থেকে এ সময়ে এটি বাতিল করার জন্য আন্দোলন শুরু হয়ে যায়। প্রথম দিকে আমরা এই আন্দোলনকে তেমন একটা গুরুত্ব দেই নি কেননা, আমাদের সামনে তখন আরও বৃহৎ আন্দোলনের প্রস্তুতি। আমি তখন ছাত্রলীগ ঢাকা নগর শাখার সাধারণ সম্পাদক এবং কেন্দ্রীয় কমিটিরও সদস্য। তোফায়েল আহমেদ এবং আ স ম আব্দুর রব যথাক্রমে ছাত্রলীগ কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক। কেন্দ্রীয় কমিটির এক সভায় নগর শাখার পক্ষ থেকে বিষয়টি উত্থাপন করা হয় কেননা, ছাত্র ইউনিয়ন (মতিয়া গ্রুপ) ইতোমধ্যে স্কুল ছাত্রদেরকে নিয়ে পাকিস্তান দেশ ও কৃষ্টি বাতিলের আন্দোলনে তাদের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় সংগ্রাম পরিষদ গঠন করেছে যা ছাত্রদের মধ্যে যথেষ্ট সাড়া জাগিয়েছে। তোফায়েল আহমেদ জানালেন স্কুলের ছাত্ররা তার কাছে আন্দোলনের দাবী নিয়ে এসেছিল কিন্তু সামনে আরও বৃহৎ আন্দোলনের কর্মসূচি আছে বলে তিনি তাদেরকে বিদায় করে দিয়েছেন, এরপর তারা ছাত্র ইউনিয়নের কাছে গিয়েছে।

কেন্দ্রীয় কমিটির ওই সভায় সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যেহেতু স্কুলের ছাত্ররা কেন্দ্রিয় নেতৃবৃন্দের কাছ থেকে 'দেশ ও কৃষ্টি' বিষয়ক আন্দোলনে সাড়া পায়নি সেহেতু প্রথমেই ছাত্রলীগের মুল নেতৃবৃন্দ সামনে না এসে নগর শাখার মাধ্যমে এই আন্দোলনকে নিজেদের দিকে নিয়ে আসতে হবে। আমরা ছাত্রলীগ ঢাকা নগর কমিটির পক্ষ থেকে শুরুতে এই আন্দোলনকে একটি সর্বদলীয় রূপ দেওয়ার চেষ্টা করি এবং দলীয় ব্যানারের বাইরে গভর্মেন্ট ল্যাবরেটরি হাই স্কুলের কৃতী ছাত্র মোস্তাক আহমেদ ও আজিমপুর গার্লস হাই স্কুলের মেধাবী ছাত্রী রোজিকে যথাক্রমে আহ্বায়ক ও যুগ্ম-আহ্বায়ক করে গঠন করা হয় 'মাধ্যমিক স্কুল ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ'। পরবর্তিতে পুরান ঢাকার বিরাট এলাকার স্কুলগুলোতে যোগাযোগের জন্যে নবাবপুর হাই স্কুলের ছাত্র, অত্যন্ত পরিশ্রমী ও কর্মঠ কর্মী আবু বকর সিদ্দিকিকেও যুগ্ম-আহ্বায়ক করা হয়। ছাত্রলীগ নগর শাখার কর্মীদের পাশাপাশি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা মেডিকেল কলেজ ও প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক ত্যাগী কর্মীরা এ সময়ে স্কুল ও এলাকাভিত্তিক যোগাযোগ এবং ছাত্র-ছাত্রীদেরকে বিভিন্ন সভায় নিয়ে আসার দায়িত্ব ভাগ করে নেন। সাংগঠনিক বিশালতা, কর্মীদের দক্ষতা, ত্যাগ এবং অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে অচিরেই ছাত্র সমাজের বড় অংশ আমাদের পক্ষে চলে আসে। এই

আন্দোলনের ফলে আমরা স্কুল ছাত্রদের মধ্যে বিশেষ করে মেয়েদের স্কুলে ব্যাপকভাবে সংগঠন গড়ে তুলতে সক্ষম হই। মমতাজ বেগম, রাফিয়া আক্তার ডলি, শামসুন্নাহার ইকু, রীনা, সাকি, শিরিন আখতার, ফোরকান, বকুল (মোস্তফা), রওশন জাহান সাথী, মোরশেদা করিম আলো (আহমেদ), রাবেয়া হায়দার (সিরাজ), খালেদা, রেহানা, লাইলী, বেবি (সিদ্ধেশ্বরী কলেজ), শেফালী প্রমুখ কর্মীরা অক্লান্ত পরিশ্রমের মাধ্যমে এবং স্বীয় সাংগঠনিক দক্ষতার দ্বারা ব্যাপক সংখ্যক স্কুল ছাত্রীদেরকে ছাত্রলীগের পতাকাতলে নিয়ে আসেন। বিশেষভাবে মমতাজ বেগম, শামসুন্নাহার ইকু এবং ফোরকানের কথা উল্লেখ করতেই হয়, এরা সে সময়ে ঢাকা শহরের দূর দূরান্তের মেয়েদের স্কুলগুলোতে ঘুরে ঘুরে সংগঠিত করেছেন। স্কুল ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের বিভিন্ন প্রোগ্রামে নিজেরা গিয়ে সদরঘাট বাংলা বাজার গার্লস স্কুল, গেন্ডারিয়া মানিজা রহমান গার্লস স্কুল, ধানমন্ডি, মীরপুর থেকে মেয়েদেরকে নিয়ে এসেছেন আবার প্রোগ্রাম শেষে নিজেরাই মেয়েদেরকে সঙ্গে করে যার যার এলাকায় দিয়ে এসেছেন।

দিশেহারা পাকিস্তানি শাসক চক্র আন্দোলনের চাপে অচিরেই এই বই প্রত্যাহার করে নিতে বাধ্য হন কিন্তু ইতোমধ্যে এই আন্দোলনের ফলে আমরা সাংগঠনিক দিক থেকে ভীষণ রকম সফলকাম হই। এই আন্দোলনের মধ্য দিয়ে ব্যাপক সংখ্যক নতুন ছাত্র-ছাত্রীকে ছাত্রলীগের পতাকাতলে নিয়ে আসা ছাড়াও আমরা যারা সরাসরি এই আন্দোলনের সাথে যুক্ত ছিলাম তাদের সাংগঠনিক দক্ষতা, আত্মবিশ্বাস ও ছাত্র সমাজের সাথে ব্যাপক যোগাযোগ এবং পাড়ায়, মহল্লায় আমাদের সংগঠন গড়ে উঠে। এ ছাড়াও এই আন্দোলনের মধ্য দিয়ে আমাদের একটি পরীক্ষিত, মেধাবি ও ত্যাগী তরুণ কর্মী বাহিনী গড়ে ওঠে। পরবর্তীকালে ঢাকা শহরের প্রায় সব স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ছাত্র সংসদ নির্বাচনে ছাত্রলীগের একচেটিয়া বিজয় এই দেশ ও কৃষ্টি বাতিল আন্দোলনেরই ফসল।

স্বাধীনতা যুদ্ধে পার্বত্য-চট্টগ্রামে
শহীদ স্বপন কুমার চৌধুরী।
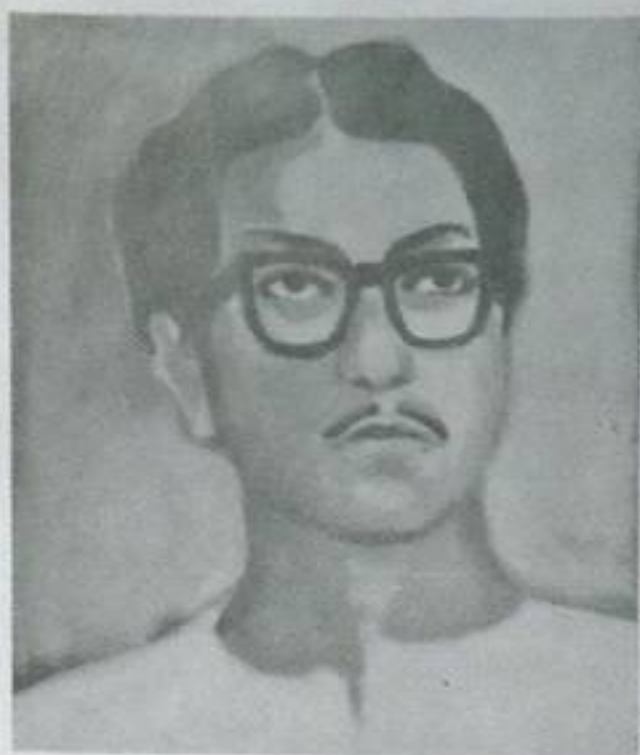
২৫ মার্চ'৭১ ইকবাল হলে পাকিস্তানি
বাহিনীর বর্বর হামলায়
শহীদ চিশতি শাহ্ হেলালুর রহমান।
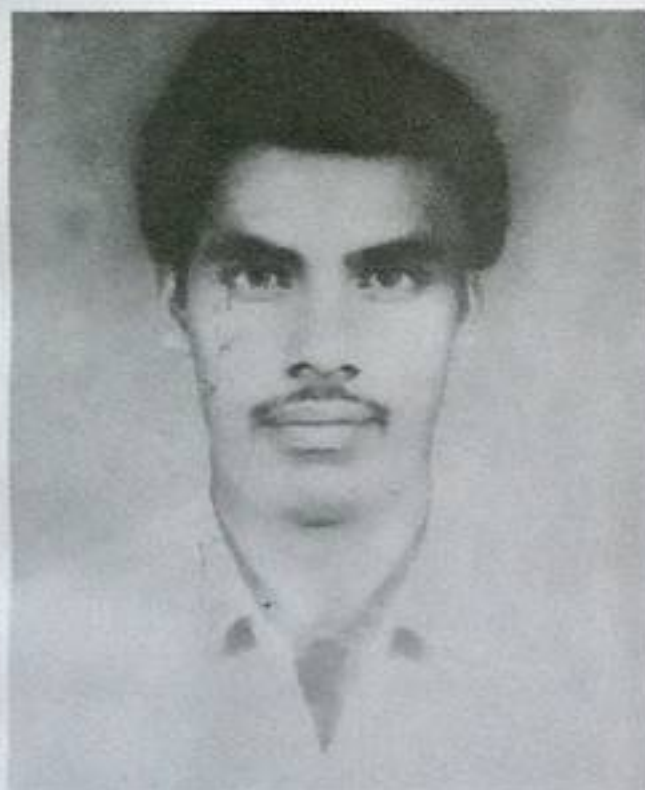
স্বাধীনতা যুদ্ধে গজারিয়ায় শহীদ
জগন্নাথ কলেজে ছাত্রলীগ শাখার
সাধারন সম্পাদক নজরুল ইসলাম।

স্বাধীনতা যুদ্ধে দাউদকান্দিতে শহীদ
ছাত্রলীগ কর্মী ও ঢাকা কলেজ ছাত্র সংসদের
সাধারণ সম্পাদক নজরুল ইসলাম।

২০ জানুয়ারী ১৯৬৯ ছাত্র মিছিলে পুলিশের গুলিতে শহীদ ছাত্রনেতা আসাদ।

২৪ জানুয়ারী' ৬৯ ছাত্র-গণ মিছিলে পুলিশের গুলিতে শহীদ নবকুমার ইনস্টিটিউটের নবম শ্রেনীর ছাত্র মতিউর।

দৈনিক পাকিস্তান

২৪ জানুয়ারী'৬৯ মতিউর গুলিবিদ্ধ হওয়ার খবরে জনতা পাকিস্তান সরকারের পত্রিকা 'দৈনিক পাকিস্তান' ভবনে আগুন লাগিয়ে দেয়।

২৪ জানুয়ারী'৬৯ কার্ফু চলাকালিন সময়ে জনতা টঙ্গীতে রেললাইন উপড়ে ফেলে।

'৬৯ গণ আন্দোলনকালিন সময়ে সচিবালয়ের সামনে ছাত্র মিছিলে ই.পি.আর. বাহিনীর সতর্ক প্রহরা।

১৫ই ফেব্রুয়ারী ১৯৭০ সার্জেন্ট জহুরের প্রথম মৃত্যুবার্ষীকিতে জহুর বাহিনীর র‍্যালি।

'আমরাও প্রস্তুত' পল্টন ময়দানে ছাত্রলীগের মহিলা কর্মীদের স্বাধীন বাংলার পতাকা ও ড্যামি রাইফেল সহকারে কুঁচকাওয়াজ, মার্চ-১৯৭১।
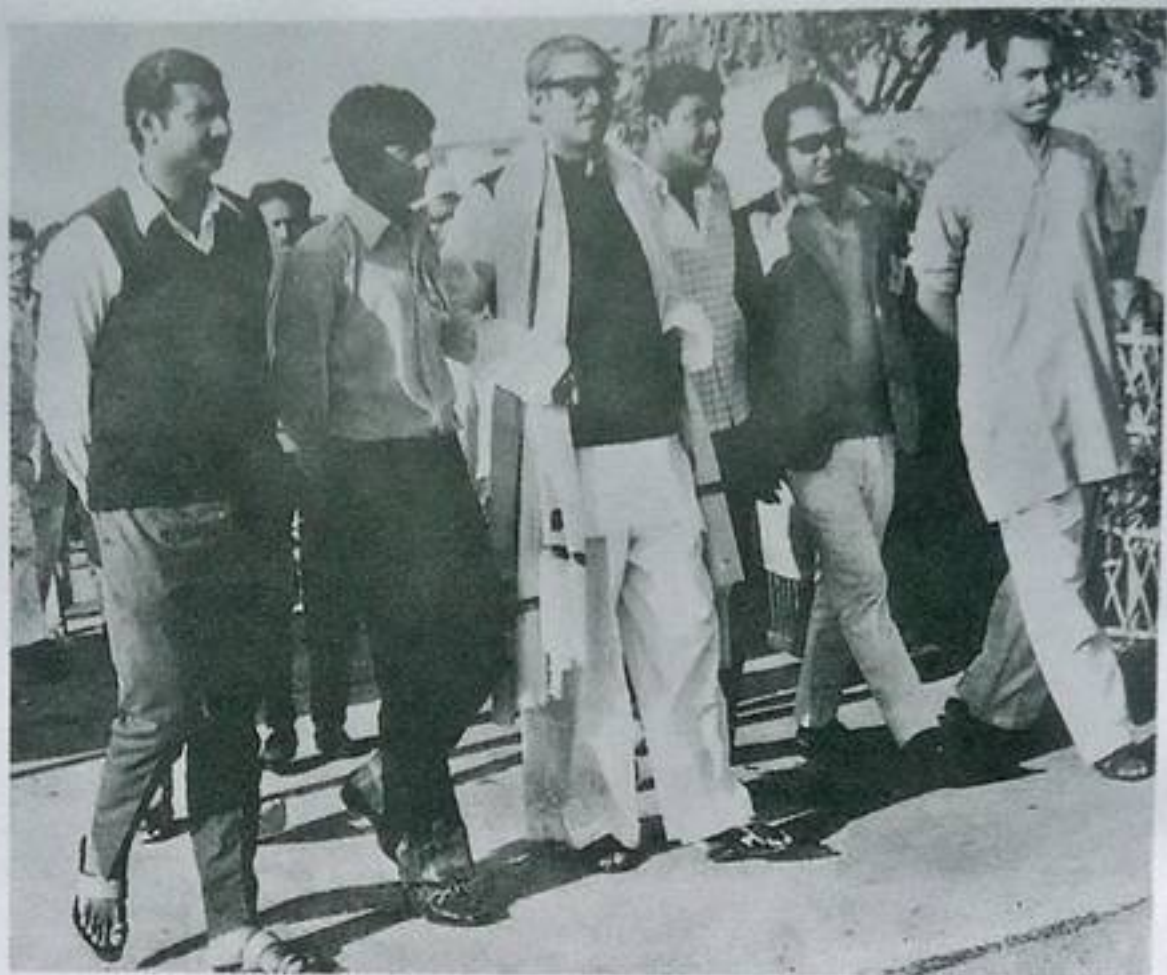
১৯৭০ এর নির্বাচনী প্রচার কাজে বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে ছাত্রনেতৃবৃন্দ।

৪ঠা জানুয়ারী ১৯৭১ ছাত্রলীগের প্রতিষ্ঠাবার্ষীকিতে পল্টন ময়দানে বিশাল জনসভায় নেতৃবৃন্দের ১১-দফা আদায়ের শপথ গ্রহন।

৩ মার্চ পল্টনে বিশাল জনসভা এখানেই স্বাধীনতার ইশতেহার পাঠ করেন ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক শাজাহান সিরাজ।

৭ই মার্চ ১৯৭১ ঢাকা রেসকোর্স ময়দানে বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ভাষন।
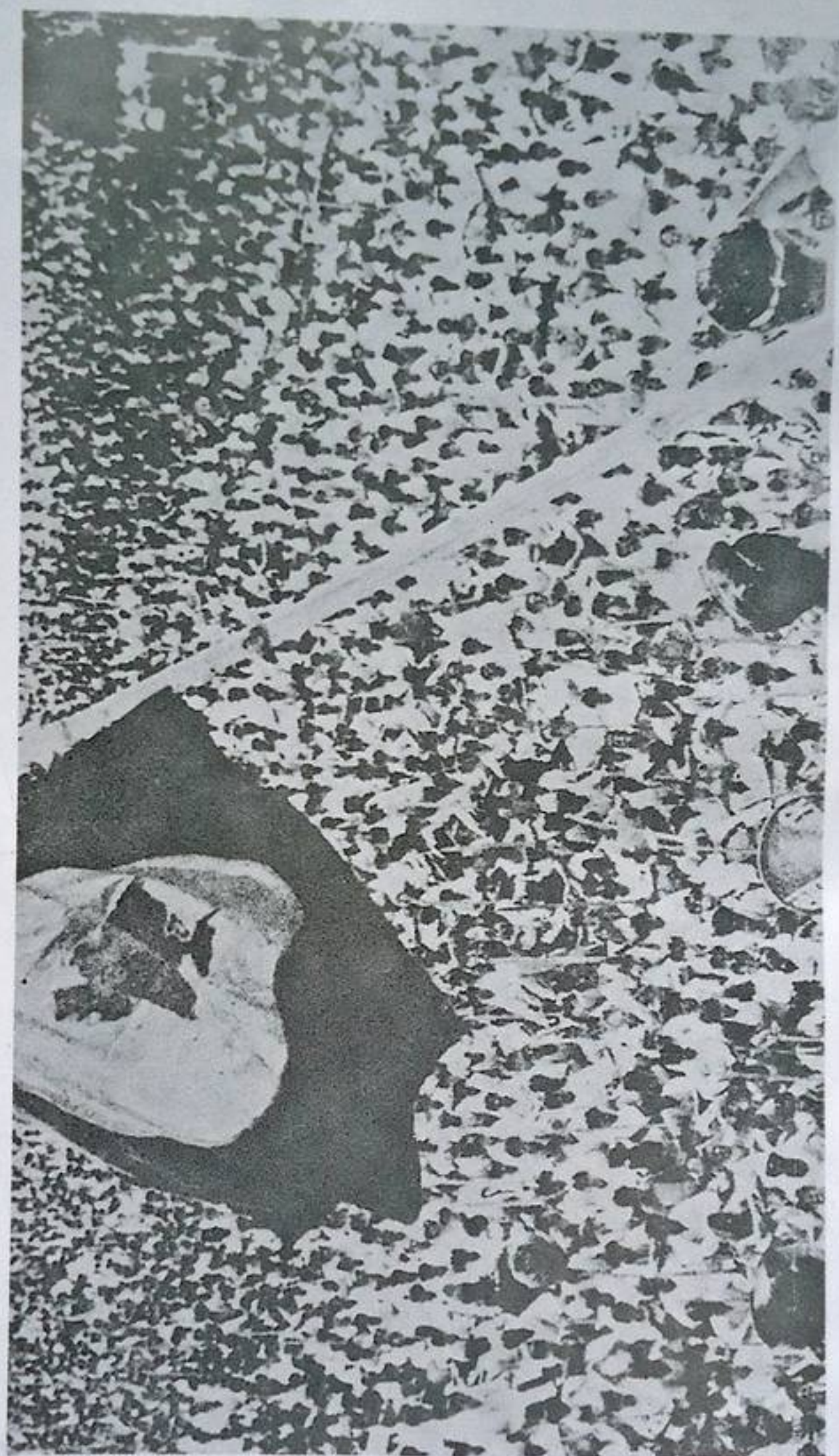
২ মার্চ ১৯৭১ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কলাভবনে ছাত্রলীগ নেতাদের স্বাধীন বাংলার পতাকা উত্তোলন।

১৯৭০-এর নির্বাচন

১৯৭০-এর ১লা জানুয়ারি দেশের সামরিক শাসকের পক্ষ থেকে রাজনৈতিক দলগুলোকে সীমিত 'ঘরোয়া' রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের অনুমতি দেওয়া হয়। এবং ১৯৭০-এর ৩০শে মার্চ অপর এক বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে ৭ই ডিসেম্বর 'এল.এফ.ও'র (LEGAL FRAME WORK ORDER) অধীনে সমগ্র পাকিস্তানে নির্বাচন অনুষ্ঠানের ঘোষণা দেওয়া হয়। সাথে সাথে আওয়ামী লীগের প্রাণশক্তি ছাত্রলীগ তার সম্পূর্ণ সাংগঠনিক শক্তি নিয়ে গণ-সংযোগ ও নির্বাচনী প্রচারের কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ে। '৬৯-এর গণ-আন্দোলন ছাত্রদেরকে সাধারণ মানুষের আপনজন করে তোলে, এ সুযোগকে কাজে লাগিয়ে আমরা '৭০-এর নির্বাচনকে পূর্ব পাকিস্তানের স্বাধিকারের প্রশ্নে 'ম্যান্ডেট' হিসেবে ঘোষণা করি।

৪ঠা জুন 'বঙ্গবন্ধু' নিজেই বাঙালির স্বাধিকারের প্রশ্নে 'রেফারেন্ডাম' হিসেবে ৭ই ডিসেম্বরের নির্বাচনে অংশগ্রহণের কথা ঘোষণা করেন। সারা দেশে ছাত্রলীগ কর্মীরাই গণ-সংযোগ এবং নির্বাচনী প্রচার ও পরিচালনায় মুখ্য ভূমিকা রাখে। দেশের বিভিন্ন এলাকার দুর্বল এবং সংবেদনশীল আসনগুলো সনাক্ত করে ছাত্রলীগ নেতৃবৃন্দ, 'বঙ্গবন্ধু'র সাথে পরামর্শক্রমে, কেন্দ্রীয়ভাবে সেসব এলাকায় নির্বাচনী প্রচার কাজের জন্যে '৭০-এর নভেম্বর মাসের প্রথম দিকেই কর্মী প্রেরণ করেন। আমাকে সে সময়ে পাবনার উল্লাপাড়ায় মওলানা আব্দুর রশীদ তর্কবাগীশ-এর নির্বাচনী এলাকায় পাঠানো হয়, সেখানকার তুখোড় ছাত্র নেতা আব্দুল লতিফ মির্জা তখন জেলে।

আ ফ ম মাহাবুবুল হককে পাঠানো হয় সিরাজগঞ্জ সদর আসনে নির্বচনের কাজে। আমরা দুজন একসাথে ঢাকা থেকে ট্রেনে রওয়না হই। উল্লাপাড়ায় পৌছে প্রথম মওলানা তর্কবাগিশের বাড়িতে উঠি, পরবর্তিতে স্হানীয় ছাত্র নেতাদের সাথে যোগাযোগ হওয়ার পর তারাই অন্যত্র আমার থাকার ব্যবস্হা করে দেন। স্থানীয় কিছু সমস্যার কারণে আমাদের প্রার্থীকে সাথে নিয়ে নির্বাচনী প্রচার সভা করা সম্ভব ছিল না। ছাত্ররাই এককভাবে আওয়ামী লীগের (নৌকা মার্কা) পক্ষে বাঙালির স্বাধিকারের প্রশ্নে ভোট চেয়ে প্রচারণা চালায়। কিছুদিন এই এলাকায় কাজ করার পরে নির্বাচনের পূর্ব মুহূর্তে ছাত্র নেতা লতিফ মির্জা জেল থেকে মুক্তি পেয়ে বেরিয়ে এলে আমি ঢাকায় চলে আসি। চলে আসার আগে লতিফ মির্জার সঙ্গে কয়েকটি গণ-সংযোগ প্রোগ্রাম এবং জনসভা করার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। মানুষের কাছে তাঁর গ্রহণযোগ্যতা এবং জনপ্রিয়তা ছিল অসম্ভব রকম, আমার কোনো সন্দেহই ছিল না যে, এই এলাকায় নির্বাচনী প্রচার এবং গণসংযোগের জন্যে তাঁর প্রচেষ্টাই যথেষ্ট।

১৯৭০-এর ৭ই ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত নির্বাচনে পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের মোট ৩০০টি আসনের মধ্যে জনসংখ্যাভিত্তিক বন্টনে পূর্ব পাকিস্তানের অংশে ছিল ১৬২টি আসন, এর মধ্যে মাত্র ২টি আসন ছাড়া (পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক পার্টির নূরুল আমিন ও পার্বত্য চট্টগ্রামে স্বতন্ত্র প্রার্থী চাকমা রাজা ত্রিদিব রায়) বাকি ১৬০টি আসন আওয়ামী লীগ একাই লাভ করে। (১৬০টি নির্বাচিত আসনের সঙ্গে ৭টি সংরক্ষিত মহিলা আসন যোগ হয়ে আওয়ামী লীগের মোট আসন সংখ্যা দাঁড়ায় ১৬৭টি)। নির্বাচনে এই বিশাল জয় লাভের মধ্য দিয়ে আওয়ামী লীগ সমগ্র পাকিস্তানে একক সংখ্যা গরিষ্ঠ দলে পরিণত হয়। পশ্চিম পাকিস্তানের মোট ১৩৮টি আসনের মধ্যে জুলফিকার আলী ভুট্টোর 'পাকিস্তান পিপলস পার্টি' লাভ করে ৮৭টি আসন। উল্লেখযোগ্য এই নির্বাচনে আওয়ামী লীগ শুধুমাত্র পূর্ব পাকিস্তানে আসন লাভ করে। পাকিস্তান পিপলস পার্টি পূর্ব পাকিস্তানে কোনও প্রার্থীই দাঁড় করায়নি। এছাড়া সামরিক জান্তার বুক পকেটের ৩টি দল কাইউম মুসলিম লীগ, কাউন্সিল মুসলিম লীগ ও জামায়াতে ইসলামি দেশের উভয় অংশে যথাক্রমে মোট ১৩২, ১১৯ ও ২০০জন প্রার্থী দাঁড় করায়। এদের মধ্যে কাইউম মুসলিম লীগ লাভ করে মাত্র ৯টি আসন, কাউন্সিল মুসলিম লীগ ৭টি আসন এবং জামায়াতে ইসলামি ৪টি আসন (সবই পশ্চিম পাকিস্তানে)। এছাড়া পূর্ব পাকিস্তানে প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ ৩০০ আসনের মধ্যে একাই ২৮৮টি আসন লাভ করে। ৭০'র নির্বাচনী ফলাফলে সামরিক শাসক এবং জুলফিকার আলী ভুট্টো সাহেবদের হিসেব গোলমাল হয়ে যায়। ইয়াহিয়া খাঁন সাহেবদের আশা ছিল পূর্ব-পাকিস্তানে বেশি আসন পেয়ে জিতলেও আওয়ামী লীগ কিছুতেই সারা দেশে সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাবে না। সেই কারণে এল.এফ.ও'র বেড়া ডিঙিয়ে ক্ষমতায় যেতে হলে শেখ সাহেব নিজেই ইয়াহিয়া খাঁনের মধ্যস্হতা মেনে নিয়ে তাঁকে দেশের 'প্রেসিডেন্ট' পদটি গ্রহণ করার প্রস্তাব দিবেন এবং তখন ক্ষমতার মূলা সামনে ঝুলিয়ে ৬-দফার প্রশ্নে আরো কিছু প্রয়োজনীয় ছাড় আদায় করে নেওয়া যাবে। কিন্তু নির্বাচনী ফলাফলে আওয়ামী লীগ একক সংখ্যা গরিষ্ঠ দলে পরিণত হওয়ায় মিলিটারি শাসকদের কুটিল হিসেব এবং পরিকল্পনা ভেস্তে যায়। 'বঙ্গবন্ধু' নির্বাচন পরবর্তী প্রতিটি সভাতেই '৭০-এর নির্বাচন যে বাঙালির স্বাধিকারের প্রশ্নে ম্যান্ডেট তাঁর সেই পূর্বের বক্তব্যে অটল থাকেন।

১৯৭১-এর ৩রা জানুয়রি ঢাকা রেসকোর্স ময়দানে (সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) এক জনসভায় 'বঙ্গবন্ধু' তাঁর দল থেকে নির্বাচিত এম.এন.এ. (জাতীয় পরিষদ সদস্য) এবং এম.পি.এ. (প্রাদেশিক পরিষদ সদস্য) প্রতিনিধিদেরকে (মোট ৪১৭জন) ৬-দফা ও ১১-দফার প্রতি আস্হাশীল থাকার পক্ষে শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন। পরদিন (৪ঠা জানুয়ারি) ছাত্রলীগের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে পল্টন ময়দানে এক ছাত্র-জনসভায় ছাত্রলীগের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক এবং ডাকসু সহ-সভাপতি ও

সাধারণ সম্পাদক যথাক্রমে নূরে আলম সিদ্দিকি ও শাহজাহান সিরাজ এবং আ স ম আব্দুর রব ও আব্দুল কুদ্দুস মাখন ছাত্রদের পক্ষ থেকে ১১-দফা দাবি আদায়ের জন্যে বজ্র কঠিন শপথ নেন।

পরিস্থিতির যথাযথ মূল্যায়ন এবং আপোসের ক্ষীণ আশা নিয়ে প্রেসিডেন্ট জেনারেল ইয়াহিয়া খাঁন ১২ই জানুয়ারি ঢাকা আসেন আওয়ামী লীগ নেতাদের সঙ্গে আলোচনার উদ্দেশ্যে। কিন্তু তাঁর এই আলোচনা সভায় ৬-দফার প্রতি 'বঙ্গবন্ধু'র আপোসহীন মনোভাব প্রত্যক্ষ করে হতাশ ইয়াহিয়া খাঁন ১৪তারিখেই ঢাকা ত্যাগ করেন। ঢাকা থেকে করাচি পৌঁছে পরদিনই জুলফিকার আলী ভুট্টোর লারকানার বাসভবনে তাঁর সঙ্গে মিলিত হন। যদিও ঢাকা ত্যাগের সময় তেজগাঁও বিমানবন্দরে প্রেসিডেন্ট জেনারেল ইয়াহিয়া খাঁন সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে শেখ মুজিবুর রহমানকেই পাকিস্তানের পরবর্তী 'প্রধানমন্ত্রী' বলে সম্বোধন করেন কিন্তু এর মাত্র কয়েকদিন পরেই ভুট্টোর লারকানা বাসভবনে তাঁর আতিথেয়তা গ্রহণ ও হাঁস শিকারের ছবি এখানকার পত্র-পত্রিকাতে প্রকাশ হলে এই সম্বোধন যে সামরিক জান্তার পক্ষ থেকে একটি নির্মম ঠাট্টা সেটি বুঝতে কারও অসুবিধে হয়নি।

সার্বিক পরিস্থিতিতে ক্রমাগত হতাশ এবং অস্থির ভুট্টো নিজেই পরিস্থিতি মূল্যায়নের জন্যে আওয়ামী লীগের সাথে আলোচনার উদ্দেশ্যে ২৭শে জানুয়ারি ঢাকা আসেন। আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দসহ স্থানীয় সব মহলের সঙ্গে আলোচনা করে পরিস্থিতি বুঝে নিয়ে ভুট্টো ৩০শে জানুয়ারি পশ্চিম পাকিস্তানে ফিরে যান।

ষড়যন্ত্রের দুই –

১৯৭০সালে সারা দেশে শান্তিপূর্ণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত এবং ফলাফল ঘোষণা হওয়ার পর সংসদ অধিবেশনের তারিখ ঘোষণার জন্যে প্রেসিডেন্ট জেনারেল ইয়াহিয়া খাঁনের উপর ক্রমাগত চাপ ক্রমাগত বৃদ্ধি পেতে থাকে। অবশেষে '৭১-এর ১১ই ফেব্রুয়ারি রাওয়ালপিন্ডিতে জুলফিকার আলী ভুট্টোর সঙ্গে ২দিন ব্যাপি বৈঠক ও শলা-পরামর্শের পর ১৩ই ফেব্রুয়ারি প্রেসিডেন্টের এক ঘোষণায় জানিয়ে দেওয়া হয় নতুন জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশন ৩রা মার্চ ঢাকায় অনুষ্ঠিত হবে। পূর্ব পাকিস্তানের নেতৃবৃন্দ এই ঘোষণাকে স্বাগত জানালেও এর ঠিক ২দিন পর অর্থাৎ ১৫ই ফেব্রুয়ারি নিরাপত্তার অযুহাত তুলে জুলফিকার আলী ভুট্টো তাঁর সাংসদদের নিয়ে ঢাকায় জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে যোগ দিতে অপারগতা প্রকাশ করেন। তিনি ঢাকায় অধিবেশন হলে এটি 'কসাইখানা' হবে বলে মন্তব্য করেন। একই সংগে পি.পি.পিকে বাদ দিয়ে সংসদ অধিবেশন বসানোর চেষ্টা করা হলে সমগ্র পশ্চিম পাকিস্তান অচল করে দেওয়া হবে বলে কঠোর হুমকি প্রদান করেন। ১৫ই ফেব্রুয়ারি ভুট্টোর এই বিবৃতি প্রকাশের ঠিক ২দিন পরে অর্থাৎ ১৭ই ফেব্রুয়ারি প্রেসিডেন্ট জেনারেল ইয়াহিয়া খাঁন তাঁর বেসামরিক মন্ত্রিসভা বাতিল করেন এবং এই ঘোষণার আবারও ঠিক ২দিন পরে ১৯শে ফেব্রুয়ারি অপর এক ঘোষণায় দেশের উভয় অংশের সকল সামরিক আইন প্রশাসকদেরকে আলোচনার জন্যে ২২শে ফেব্রুয়ারি সামরিক সদর দফতর রাওয়ালপিন্ডিতে ডাকা হয়।

১৯৭১-এর ২২শে ফেব্রুয়ারি পাকিস্তানের রাজধানী রাওয়ালপিন্ডিতে সর্বোচ্চ গোপনীয়তার মধ্যে অনুষ্ঠিত সামরিক আইন প্রশাসকদের এই সভার পরে পরেই ২৭শে ফেব্রুয়ারি থেকে 'পি.আই.এ'র বিমানে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে ২ ব্যাটেলিয়ন (২২বেলুচ এবং ১৩ ফ্রন্টইয়ার ফোর্স) সেনা পূর্ব পাকিস্তানে পাঠানোর কাজ শুরু হয়। একই সময়ে এদের ভারি অস্ত্র এবং অন্যান্য সরঞ্জামাদি জাহাজে করে করাচি বন্দর থেকে চট্টগ্রাম বন্দরে পাঠানো হয়।

১লা মার্চ ১৯৭১সালে, সৈন্য এবং অস্ত্র পরিবহণ কাজের অগ্রগতি সন্তোষজনক বিবেচনা করে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জেনারেল ইয়াহিয়া খাঁনের পক্ষ থেকে এক অনির্ধারিত বেতার ভাষণের মাধ্যমে ৩রা মার্চে ঢাকায় অনুষ্ঠিতব্য পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের নতুন সংসদের প্রথম অধিবেশন অনির্দিষ্ট সময়ের জন্যে স্থগিত ঘোষণা করা হয়। এই ঘোষণার পরপরই ছাত্রদের পক্ষ থেকে ঢাকা শহরে বিক্ষোভ মিছিল বের করা হয় এবং পরেরদিন অর্থাৎ ২রা মার্চ সাধারন ধর্মঘটসহ সকালে বটতলায় ছাত্র জমায়েত ও বিকেলে পল্টন ময়দানে জনসভার কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়।

তোমার পতাকা যারে দাও

১৯৭০-এর ১৫ই ফেব্রুয়ারি সার্জেন্ট জহুরুল হকের ১ম মৃত্যু বার্ষিকী আমাদের পক্ষ থেকে জাতীয় বীরের মর্যাদায় পালন করা হয়। জহুরবাহিনীর পক্ষ থেকে আমরা সাদা ড্রেস পরে (মেয়েরা লাল পাড়ের সাদা শাড়ি এবং ছেলেরা সাদা প্যান্ট, সাদা সার্ট ও পিটি জুতা) কাঠের ড্যামি রাইফেল দিয়ে প্রকাশ্য রাস্তায় কুঁচকাওয়াজের মাধ্যমে দিনটিকে স্মরণ করি।

১৯৭০-এর ৭ই জুন, ৬-দফা দিবসের দিন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে পল্টন ময়দানে শ্রমিক-জনতার পক্ষ থেকে সংবর্ধনা জানানোর ঘোষণা দেওয়া হলে আমরাও ঐদিনই জহুর বাহিনীর পক্ষ থেকে বঙ্গবন্ধুকে অভিবাদন জানানোর সিদ্ধান্ত নেই। এ উপলক্ষ্যে কর্মসূচী চূড়ান্ত করার জন্য ছাত্রলীগের স্বাধীনতাপন্থীদের নেতৃস্থানীয় ও বিশিষ্ট কর্মীদের নিয়ে ৬ই জুন সন্ধ্যায় প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের আহসানউল্লাহ হলের ছাত্র-সংসদ কক্ষে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় প্রস্তাব করা হয় বঙ্গবন্ধুকে সামরিক কায়দায় অভিবাদন করে জহুর বাহিনীর পক্ষ থেকে একটি স্বতন্ত্র 'সিম্বলিক পতাকা' প্রদান করার। সকলের কাছে প্রস্তাবটি গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হলে জহুর বাহিনীর পতাকা কী হতে পারে সে সম্পর্কে বিভিন্ন ধরনের প্রস্তাব আসতে থাকে। প্রথমেই শাজাহান সিরাজ প্রস্তাব রাখেন পতাকায় উদীয়মান লাল সূর্য রাখার জন্যে, এটিকে মেনে নিয়ে প্রস্তাব আসতে থাকে পতাকার জমিন নিয়ে। সাদা জমিন বাদ দেওয়া হয় জাপানের পতাকার অনুরুপ বলে, এরপর সবুজ রংটি বাংলাদেশকে বুঝানোর জন্যে সবচেয়ে উপযুক্ত বিবেচিত হলেও পাকিস্তানের পতাকার জমিনের রং হিসেবে এটিকে বাদ দেওয়া হয়। এ সময়ে আমাদের মধ্যে উপস্থিত আর্টিস্ট শিব নারায়ণ দাস (ছাত্রলীগের এই একনিষ্ঠ সার্বক্ষণিক কর্মীকে আসন্ন ডাকসু নির্বাচনের পোস্টার লেখার জন্যে সে সময়ে কুমিল্লা থেকে ঢাকায় নিয়ে আসা হয়েছিল) প্রস্তাব করেন পতাকার জমিন গাঁঢ় সবুজ রংয়ে করার জন্যে। এই রংয়ের ব্যাখ্যা দিয়ে তিনি বলেন 'যেহেতু আমরা বিশ্বাস করি রক্ত এবং ত্যাগের বিনিময়েই একমাত্র স্বাধীনতা আসতে পারে সেই হেতু গাঁঢ় সবুজ রংই সবচেয়ে উপযুক্ত রং, কেননা সবুজের সাথে লাল মিশেই গাঁঢ় সবুজ হয়'। তাঁর এই ব্যাখ্যার পর সকলেই পতাকার জমিন হিসেবে গাঁঢ় সবুজ রংটিকেই একবাক্যে মেনে নেন। এরপর প্রস্তাব আসে যেহেতু আমরা (জহুর বাহিনীর সদস্যরা) বাংলাদেশের স্বাধীনতায় বিশ্বাসী সেই হেতু এই বাহিনী এবং পতাকা নিয়ে যেন কোনও বিভ্রান্তি না থাকে সেজন্য 'সোনার বাংলা'র প্রতীক বাংলাদেশের সোনালি মানচিত্র উদীয়মান সূর্যের মধ্যে এঁকে দেওয়া হোক, এই প্রস্তাবটিও উপযুক্ত বিবেচনা করে সকলেই এক বাক্যে গ্রহণ করেন।

এদিকে আলাপ আলোচনায় অনেক রাত হয়ে গেলে সকলের খেয়াল হল এত রাতে পতাকা তৈরির কাপড় এবং জিনিষপত্র কী ভাবে যোগাড় হবে। সভায় উপস্থিত ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক আ স ম আব্দুর রব সে রাতে কাপড় এবং রং যোগাড় করার দায়িত্ব নেন। কামরুল আমান খসরুকে পাঠিয়ে নিউ মার্কেট এলাকা থেকে দোকান খুলিয়ে গাঁঢ় সবুজ ও লাল রংয়ের কাপড় এবং সোনালি রঙের কৌটা যোগাড় করে আনা হয়। এরপর জগন্নাথ কলেজের নজরুল ইসলাম (স্বাধীনতা যুদ্ধে শহীদ) এবং ছাত্রলীগ কেন্দ্রীয় কমিটির সহ-সম্পাদক একরামুল হক এই দুইজন গিয়ে বলাকা ভবন (৩য় তলা) ছাত্রলীগ অফিসের পাশের রুমে অবস্থিত 'পাক ফ্যাশন' নামের দর্জির দোকানের কর্মচারিদেরকে ঘুম থেকে তুলে পতাকাটি সেলাই করিয়ে নিয়ে আসেন। সবশেষে গভীর রাতে পতাকা তৈরি উপকরণনাধি যখন শিব নারায়ণ দাসের হাতে এসে পৌঁছে লাল সূর্যের মধ্যে সোনালি মানচিত্র আঁকার জন্যে, তখন দেখা গেল মানচিত্র আঁকারমত প্রয়োজনীয় চিকন তুলি তাঁর কাছে নেই, তাঁর কাছে সবই পোস্টার লিখার মোটা তুলি। এ সময়ে নিজের সৃজনশীল বুদ্ধি কাজে লাগিয়ে ইকবাল হলের ১১৮নং কক্ষে সারা রাত জেগে প্রচন্ড উৎসাহ এবং একাগ্রতা সহকারে রংয়ের কৌটায় দেয়াশলাইয়ের কাঠি ডুবিয়ে শিবনারায়ণ দাস পতাকায় বাংলাদেশের সোনালী মানচিত্রটি আঁকেন। ৭ই জুন সকালে শিব নারায়ন দাস তাঁর কাজ শেষ করে পতাকাটি ইকবাল হলের ১১৮নং কক্ষের জানালায় শুকাতে দেন, সে সময়ে ভোরের আকাশে নতুন সূর্য উঁকি দিচ্ছে, কক্ষের মেঝেতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে সোনালি রং মাখানো অসংখ্য দেয়াশলাইয়ের কাঠি এবং মেঝেতে জ্বল জ্বল করছে পতাকার কাপড় ভেদ করে আসা সোনালি মানচিত্রের ছাপ।

১৯৭০-এর ৭ই জুন সকালে আমরা কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারের পাদদেশে সমবেত হয়ে সেখান থেকে ব্যান্ডের (জগন্নাথ কলেজ থেকে নজরুল ইসলাম নিজ উদ্যোগে ব্যান্ডের দল যোগাড় করে আনেন) তালে তালে পা ফেলে বাছা বাছা কর্মীদের নিয়ে গঠিত জয়ের বাহিনী নতুন পতাকাটি সহকারে হাজির হয় পল্টন ময়দানে। সেখানে তখন বঙ্গবন্ধুকে সংবর্ধনা দেওয়ার কাজ চলছিল। আমাদের পক্ষ থেকে পূর্ব নির্ধারিত প্রোগ্রাম অনুযায়ী আ স ম আব্দুর রব বঙ্গবন্ধুকে সামরিক কায়দায় অভিবাদন করে সামনে গিয়ে হাটু গেড়ে বসে পতাকাটি উপহার দেন, বঙ্গবন্ধুও অভিবাদন সহকারে পতাকাটি গ্রহণ করেন। বঙ্গবন্ধু তৎকালিন ছাত্রলীগের মত ও ধারা সম্পর্কে পুরোপুরি অবহিত ছিলেন, তাই পতাকাটি হাতে নিয়েই তিনি সম্পূর্ণ বিষয়টি বুঝে ফেলেন এবং আ স ম রবের দিকে তাকিয়ে মুচকি হেসে পাশে দাঁড়ানো শেখ কামালের হাতে পতাকাটি দিয়ে দেন। সেদিনই পল্টন ময়দানে অনুষ্ঠান শেষে 'পতাকাটি বাসায় রাখা ঠিক হবে না, এটা বরং আপনার কাছে থাক' বলে শেখ কামাল পতাকাটি আমাকে দিয়ে দেয়। আমি পতাকাটি বাসায় নিয়ে আসি এবং আমার ঘরে বইয়ের তাকে

এটিকে ভাঁজ করে রেখে দেই। এরপর নতুন নতুন ঘটনা আর কর্মসূচির মধ্যে পতাকাটির কথা সবাই একরকম ভুলেই যাই। '৭১-এর ফেব্রুয়ারি মাসে ঢাকা শহরের স্কুল, কলেজ ও আঞ্চলিক শাখা থেকে ২১শে ফেব্রুয়ারি উপলক্ষে যে সমস্ত সংকলন বের হয় তার সৌজন্য কপি এসে জমা হয় আমার বইয়ের তাকে এবং এ গুলোর নিচে পতাকাটি সম্পূর্ণ চাপা পড়ে যায়।

১৯৭১-এর ১লা মার্চ দুপুরে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জেনারেল ইয়াহিয়া খাঁনের পক্ষ থেকে এক অনির্ধারিত বেতার ভাষণের মাধ্যমে জাতীয় সংসদের অধিবেশন অনির্দিষ্ট সময়ের জন্যে স্থগিত ঘোষণা করা হয়। এই ঘোষণার তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় জগন্নাথ কলেজসহ ঢাকা শহর ছাত্রলীগের বিভিন্ন ইউনিটের পক্ষ থেকে বিক্ষোভ মিছিল বের হয় এবং পরদিন অর্থাৎ ২রা মার্চ ছাত্রলীগের পক্ষ থেকে হরতালসহ সকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বটতলায় ছাত্র জমায়েত ও বিকেলে পল্টন ময়দানে জনসভার একক কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়।

২রা মার্চ সকালে পাড়ার ছেলেরা এক এক করে আমার বাসায় আসে একসাথে মিছিল করে বটতলায় যাওয়ার উদ্দ্যেশ্যে। ওদেরকে রুমে বসিয়ে রেখে আমি ভেতরে যাই সেদিনকার মতো বেরিয়ে যাওয়ার প্রস্তুতি নিতে। পাড়ার ছেলেরা রুমে বসে বইয়ের তাক থেকে ২১শে ফেব্রুয়ারির সংকলন গুলো দেখতে থাকলে সংকলনের নিচ থেকে পতাকাটি বেরিয়ে পড়ে। এরা কেউই জহুর বাহিনীর সাথে সম্পৃক্ত ছিল না এবং সে কারণেই পতাকার বিষয়ে কিছুই জানত না কিন্তু পতাকার মাঝখানে বাংলাদেশের মানচিত্র থাকায় সে সময়ে এর মানে বুঝে নিতে কারও অসুবিধে হয়নি। আগ্রহ, উত্তেজনা এবং উৎসাহের সঙ্গে পতাকাটি উপস্থিত সকলের হাতে হাতে ঘুরতে থাকে। এসময়ে গুলবাগ আমার বাসারপাশে রেল লাইন দিয়ে একটি ট্রেন কমলাপুর থেকে ছেড়ে সম্ভবত ময়মনসিংহ যাচ্ছিল, ছেলেরা রেল লাইনের পাশের লাউয়ের মাচা থেকে একটি বাঁশ খুলে নিয়ে পতাকাটি বাঁধে এবং যেহেতু সেদিন ছাত্র সমাজের পক্ষ থেকে হরতাল ডাকা হয়েছে তাই ওরা পতাকাটি হাতে নিয়ে রেল লাইন অবরোধ করে দাড়ায়। ট্রেন থামার পর যাত্রীরাও নতুন ধরনের পতাকা দেখে ভীড় করে নেমে আসে। এরমধ্যে আমি রেডি হয়ে যখন বাসার বাইরে আসি তখন বাসার সামনে পতাকাটি ঘিরে ছাত্র-জনতার বেশ বড়সড় ভীড় জমে গেছে। আমি এসে এদের সাথে যোগ দিতে পতাকাটি আমার হাতে দিয়ে দেওয়া হয় এবং আমরা মিছিল করে বটতলার দিকে রওয়ানা হই। মিছিলটি নিয়ে সিদ্ধেশ্বরী হয়ে রমনা 'প্রেসিডেন্ট হাউস'(বর্তমানে রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন 'সুগন্ধা')এর মিলিটারি প্রহরীদের উৎসুক চোখের সামনে দিয়ে স্লোগান দিতে দিতে আমরা রমনাপার্ক এবং রেসকোর্স ময়দানের (বর্তমানে সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) মাঝখান দিয়ে কোণাকুণি হেটে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কলাভবন বটতলার সভাস্থলে গিয়ে উপস্হিত হই।

আমরা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় পৌছানোর আগেই বটতলায় সভার কাজ শুরু হয়ে গেছে। ছাত্র সমাবেশের প্রস্তুতি থাকায় সেদিন বটতলায় কোনও মঞ্চের ব্যবস্থা ছিল না কিন্তু ধারণার বাইরে ছাত্র-জনতা উপস্থিত হওয়ায় ছাত্রলীগের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক যথাক্রমে নূরে আলম সিদ্দিকী ও শাজাহান সিরাজ, ডাকসুর সহ-সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক আ স ম আবদুর রব এবং আবদুল কুদ্দুস খান মাখন ছাড়াও কেন্দ্রীয় কমিটির সহ-সভাপতি স্বপন কুমার চৌধুরী, সাংগঠনিক সম্পাদক মনিরুল হক চৌধুরী, সহ-সম্পাদক একরামুল হক, বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক জিনাত আলী ও মোয়াজ্জেম হোসেন খান মজলিশ, ঢাকা শহর শাখার প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক রেজাউল হক চৌধুরী মোশতাক প্রমুখ নেতারা বাধ্য হয়ে, বটতলার পাশে, কলাভবনের পশ্চিম দিকের প্রবেশ মুখের সিঁড়ির ছাদে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা দিচ্ছিলেন। আমরা পতাকা নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের চত্বরে ঢুকার অবব্যহতি পরেই চারদিকে বিপুল সাড়া পড়ে যায়, সামনে বসে যারা বক্তৃতা শুনছিলেন তারা সকলে দাঁড়িয়ে প্রচন্ড হাত তালি দিয়ে আমাদেরকে অভিনন্দন জানায়। এ সময়ে স্লোগানে স্লোগানে চারদিক মুখরিত হয়ে ওঠে। সামনের দিক থেকে সবাই সরে আমাদেরকে সিঁড়ির ছাদের কাছে যাওয়ার পথ করে দেয়, সভার মাঝ খান দিয়ে হেটে সিঁড়ির ছাদের নিচে গিয়ে পতাকাটি উপরে ছাদে দাঁড়ানো আ স ম আব্দুর রবের হাতে তুলে দেই। আ স ম আব্দুর রব পতাকাটি হাতে নিয়ে উপরে তুলে ধরে দোলাতে থাকলে সারা বিশ্ববিদ্যালয় চত্বর মুহরমুহ স্লোগানে প্রকম্পিত হয়ে উঠে। এরপর আর কারও পক্ষে বক্তৃতা দেওয়া বা সভার কাজ চালানো সম্ভব ছিল না, বিকেলে পল্টন ময়দানে জনসভায় আসার আহ্বান জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। স্লোগান দিতে দিতে বটতলা থেকে অসংখ্য মিছিল যার যার গন্তব্যের দিকে বেরিয়ে যায় বিকালের সভায় আসার প্রস্তুতি নেওয়ার জন্যে।

২রা মার্চ বিকেলে পল্টন ময়দানে ছাত্র-জনসভায় সেদিন এক অভুতপূর্ব দৃশ্য পরিলক্ষিত হয়, সেদিন সকালে যারা বটতলার ছাত্রসমাবেশে উপস্থিত ছিলেন তারা যে যেভাবে পতাকাটি দেখেছেন সেভাবেই ছোট, বড়, মাঝারি আকারের হাজার হাজার পতাকা বানিয়ে নিয়ে আসেন। একদিন যে স্বপ্ন নিয়ে আমরা এই পতাকার রূপ দিয়েছিলাম একটি আকস্মিক ঘটনার মধ্য দিয়ে সেটি এমনিভাবে জনগণের কাছে পৌছে যায়, পরিণত হয় জনতার সম্পদে।

১৯৭১-এর ২রা মার্চ এই ঘটনার পরদিন ৩রা মার্চ সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক শাজাহান সিরাজ পল্টন ময়দানে ছাত্র-জনসভায় বঙ্গবন্ধুর উপস্থিতিতে স্বাধীনতার ইশতেহার পাঠ করেন। পরবর্তিতে ছাত্রলীগের বর্ধিত কমিটির সভায় তৎকালিন কেন্দ্রীয় কমিটির সহ-সভাপতি স্বপন কুমার চৌধুরী (স্বাধীনতা যুদ্ধে চট্টগ্রামের বি.এল.এফ. আঞ্চলিক কমান্ডার হিসেবে দায়িত্ব পালনরত অবস্থায় শহীদ হন)

'স্বাধীনতার প্রস্তাব' উত্থাপন করেন। এই বর্ধিত সভায় একটানা ৫দিনব্যাপী আলাপ আলোচনার পর স্বপন কুমার চৌধুরীর প্রস্তাব অনুযায়ী পতাকা ও জাতীয় সংগীত সম্বলিত 'স্বাধীনতার ঘোষণা পত্র' অনুমোদন দেওয়া হয়। ২৩শে মার্চ 'পাকিস্তান দিবস'-এর দিন ছাত্রলীগের পক্ষ থেকে পল্টন ময়দানে আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন এবং 'স্বাধীনতার ইশতেহার' পাঠের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। ২৩ মার্চ পল্টন ময়দানে হাসানুল হক ইনু বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করেন এবং কামরুল আমান খসরু একটি পয়েন্ট .২২ রাইফেল দিয়ে শূন্যে ফায়ার করে গান স্যালুট প্রদান করেন। এ সময়ে মাইকে আমাদের জাতীয় সংগীত 'আমার সোনার বাংলা.....' গানটিও বাজানো হয়।

মার্চ মাসের মাঝামাঝি ছাত্রসংগ্রাম পরিষদের পক্ষ থেকে দেশের প্রতিষ্ঠিত শিল্পী কামরুল হাসানকে দিয়ে মাঝখানের সূর্যসহ সম্পূর্ণ পতাকার আনুপাতিক মাপ নিয়ে ডিজাইন করে নেওয়া হয় এবং জনসাধারনের জ্ঞাতার্থে দেশের পত্র-পত্রিকায় ছাপিয়ে দেওয়া হয়। দেশ স্বাধীন হওয়ার পরে স্বাধীন দেশের যথাযোগ্য আনুষ্ঠানিক পতাকা হিসেবে মাঝখানে আঁকা বাংলাদেশের মানচিত্রটি তুলে দেওয়া হয়।

মার্চের দিনলিপি

১৯৭১-এর ১লা মার্চ পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জেনারেল ইয়াহিয়া খানের পক্ষ থেকে নব-নির্বাচিত সংসদ অধিবেশন অনির্দিষ্ট সময়ের জন্যে স্থগিত ঘোষণা করা হলে দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি খুব দ্রুত উত্তপ্ত হয়ে উঠতে থাকে। দেশে পরিকল্পিত ভাবে বিশৃঙ্খলা এবং অরাজকতা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে পূর্বেই সামরিক শাসকদের হাল ছেড়ে দেওয়ায় আইন শৃঙ্খলা এবং প্রশাসনিক কার্যক্রম সে সময়ে মূলত বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে ছাত্রদের দ্বারা পরিচালিত বা নিয়ন্ত্রিত হতো। ঢাকা শহরের পাড়ায়, শ্রমিক এলাকায়, মার্কেটে সে সময়ে 'স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী' গঠন করে নিয়মিত পাহারা ও টহল দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। দেশের সর্বময় ক্ষমতার অধিকারি সামরিক জান্তা তখন বেসামরিক প্রশাসনিক ব্যবস্থা ছেড়ে দিয়ে ষড়যন্ত্রের ছক কাটতে এবং সামরিক প্রশাসন সাজাতেই বেশি ব্যস্ত। বাণিজ্যিক পণ্য পরিবহণের জাহাজ এবং পি.আই.এ'র প্লেনে করে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে অস্ত্র সামরিক ও আধা-সামরিক বাহিনীর লোকজনদেরকে পূর্ব পাকিস্তানে আনা হয়। ঢাকায় পি.আই.এ.'র বাঙালি কর্মচারীরা সামরিক লোকজন, অস্ত্র এবং গোলা-বারুদ পরিবহণ করতে অস্বীকার করে ও ধর্মঘট আহ্বান করে। চট্টগ্রাম বন্দরের শ্রমিকরাও এ সময়ে করাচি থেকে বাণিজ্যিক পণ্য পরিবহণের জাহাজ সোয়াতে করে আনা অস্ত্র এবং গোলা-বারুদ ও সামরিক সরঞ্জামাদি খালাস করতে অস্বীকার করে। পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ এখানকার সামরিক প্রশাসনের সাথে যোগাযোগ করে সংসদ অধিবেশন স্থগিত হওয়ার কারণ এবং কবে নাগাদ পুনরায় সংসদ অধিবেশন ডাকা হতে পারে সে সম্পর্কে কোনও প্রকার খবর অথবা তথ্য জানতে ব্যর্থ হন।

এই উত্তপ্ত, অনিশ্চিত ও রাজনৈতিক পরিস্থিতির মধ্যে বঙ্গবন্ধু ৭ই মার্চ রমনা রেসকোর্স ময়দানে তাঁর ঐতিহাসিক ভাষণ দেন। মাত্র অল্প সময়ের এক আবেগপূর্ণ ছন্দময় ভাষণে অনেকের প্রত্যাশা অনুযায়ী সরাসরি স্বাধীনতার ঘোষণা না থাকলেও এই ভাষণের মধ্যে সব না বলা কথাই বলা হয়ে যায়। এই ভাষণের প্রতিক্রিয়ায় সামরিক জান্তা ও ভুট্টো সম্পূর্ণ চুপ থাকায় সবার মনেই অজানা আশংকা জেগে উঠে। সবাই বুঝতে পারে সামরিক জান্তার পক্ষ থেকে বড় ধরনের আঘাতের প্রস্তুতি চলছে কিন্তু সেটি কত নির্মম, নিষ্ঠুর আর নৃশংস হতে পারে সে সম্পর্কে তখন পর্যন্ত কোনোরকম ধারনাই ছিল না আমাদের। নিজ দেশের ব্যাপক নিরস্ত্র জনগোষ্ঠীর উপর এত নিষ্ঠুরভাবে আধুনিক যুদ্ধাস্ত্রের মহড়া হতে পারে সেটি আমাদের কল্পনারও বাইরে ছিল। আমরা তখন যারা সক্রিয়ভাবে রাজনৈতিক কর্মকান্ডের সাথে জড়িত ছিলাম তারা গ্রেফতার এড়াতে রাতে কেউ বাড়িতে থাকতাম না। প্রথম দিকে ইকবাল হল (বর্তমানে জহুরুল হক হল), জিন্নাহ্ হল (বর্তমানে সূর্য সেন হল) অথবা মহসিন হলে আমাদের কোনও বন্ধু অথবা রাজনৈতিক সহকর্মীর রুমে সিট ভাগাভাগি করে থাকতাম। কিন্তু ৭ই মার্চের পর পরিস্হিতি আরও উত্তপ্ত হয়ে উঠলে আমরা ঐসব

হলে না থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান ভবনের পাশের হলগুলোর (শহীদুল্লাহ হল, এফ.এইচ. হল) খালি রুমে গিয়ে থাকতাম। হলগুলো পূর্বেই সম্পূর্ণ খালি হয়ে যাওয়ায় আমাদের পক্ষে এখানে থাকাটা তুলনামুলক ভাবে নিরাপদ এবং কম ঝুঁকি পূর্ণ ছিল।

এ সময়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ ঢাকা শহরের বিভিন্ন স্কুল, কলেজ ও আঞ্চলিক শাখায় ক্যাডেট এবং স্কাউট ছাত্রদের উদ্যোগে ড্যামি রাইফেল দিয়ে কুঁচকাওয়াজ ও যুদ্ধের মহড়া ট্রেনিং দেওয়া হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় ভুট্টো, মতিঝিল টি.অ্যান্ড.টি কলেজের মাঠে দুদু, পিয়ারু, এবং জগন্নাথ কলেজে নজরুল ইসলাম এছাড়া মতিঝিল কলোনি মাঠ, সিদ্ধেশ্বরী স্কুলের মাঠ, মীরপুর, ঝিগাতলা প্রভৃতি এলাকায় ছাত্রলীগ কর্মীদের উদ্যোগে সামরিক ট্রেনিং ক্যাম্পের আয়োজন করা হয়। কিছু কিছু যায়গায় ছুটিতে আসা অথবা অবসরপ্রাপ্ত ই.পি.আর, আর্মি এবং পুলিশ বাহিনীর দেশপ্রেমিক সদস্যদেরকেও নিজ নিজ এলাকার ছাত্র, শ্রমিক ও জনসাধারণকে ট্রেনিং দিতে দেখা যায়। তখন বিচ্ছিন্নভাবে ছাত্রদের দ্বারা বন্দুক, পিস্ত ল সংগ্রহের ঘটনাও ঘটে, অনেকে এসে ইকবাল হলে ছাত্র নেতৃবৃন্দের কাছে নিজেদের লাইসেন্স করা বন্দুক, পিস্তলও জমা দিয়ে যান। সাধারণ মানুষের মধ্যে যুদ্ধে প্রস্তুতি নেওয়ার চেতনা এতটাই বিস্তৃতি লাভ করে যে, বাড়ির দারোয়ান, চাকর, ড্রাইভার এরাই ইকবাল হলে এসে আমাদেরকে খবর দিত কোন বাড়িতে গেলে বন্দুক, পিস্তল ইত্যাদি পাওয়া যাবে। পুরান ঢাকার এক অতি উৎসাহী লেদ মেশিনের মালিক ঐ সময়ে ইকবাল হলে এসে আমাদেরকে চিকন লোহার রড দিয়ে তৈরি অনেকগুলো ছোট ছোট চারপায়া দিয়ে যান। এর চার পায়া এমন ভাবে ডিজাইন করে তৈরি করা হয়েছিল যে মাটিতে ফেললে এর তিনটি পায়া নীচে এবং একটি পায়া উপরে থাকবে, প্রতিটি পায়ার মাথাগুলো আবার মেশিনে চোখা করা ছিল। ভদ্রলোকের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল সামরিক অভিযান শুরু হলে যদি কোনো ভাবে এ গুলোকে রাস্তায় ছড়িয়ে দেওয়া যায় তবে সামরিক যানের চাকা ফুটো হয়ে ওরা আর অগ্রসর হতে পারবে না। উপস্থিত ছাত্রলীগ কর্মীরা অত্যন্ত আগ্রহ সহকারে এগুলো সব কাড়াকাড়ি করে নিয়ে যায়। কিন্তু প্রকৃত কাজের সময় এ গুলোর ব্যবহার হয়েছে বলে পরবর্তীতে শোনা যায়নি।

এর মধ্যে আমাদের জন্যে সবচেয়ে উত্তেজনাকর ঘটনাটি ঘটে মার্চের ১০তারিখের দিকে। সায়েন্স ল্যাবরেটরির কয়েকজন বাঙালি বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা এসে আমাদের নেতৃবৃন্দের কাছে শক্তিশালী বোমা বানানোর প্রস্তাব দেন এবং এ ধরনের বোমা বানানোর যাবতীয় উপকরণ সায়েন্স ল্যাবেরটরিতেই আছে বলে তাঁরা জানান। তাঁদের সাথে শলা-পরামর্শের পর ঠিক করা হয় যে কোনও একদিন সন্ধার পর তাদেরকে সায়েন্স ল্যাবরেটরির ভেতরে বাসা থেকে ধরে (সে সময়ে এই ল্যাবরেটরির বেশির ভাগ পদে পশ্চিম পাকিস্তানিরা কর্মরত থাকায় নিরাপত্তার স্বার্থে এ ধরনের

পরিকল্পনা করা হয়) নিয়ে এসে সেই সব রাসায়নিক জারগুলোকে সনাক্ত করে আমরা সেগুলো নিয়ে আসব, এরপর তাঁরা এসে ওগুলো দিয়ে কী ভাবে বোমা বানানো যায় সে সব আমাদের কর্মীদের শিখিয়ে দিবেন।

সিরাজুল আলম খানের নির্দেশে কাজী আরেফ আহমেদের সরাসরি তত্ত্বাবধান ছাত্রলীগ ঢাকা নগর শাখা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ও প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় শাখা থেকে বাছা বাছা কর্মী নিয়ে এই অভিযানের আয়োজন করা হয়। ২/১দিন পরেই সন্ধ্যায় ইকবাল হলের মাঠে কাজী আরেফ আহমেদের কাছ থেকে সংক্ষিপ্ত ব্রিফিং নিয়ে আক্রমণকারী দলের সদস্য হিসেবে আমরা প্রথম গাড়িতে উঠি। এই গাড়ির চালক ছিলেন ঢাকা শহর ছাত্রলীগের সহ-সভাপতি সেলিম ভূঁইয়া এ ছাড়া গাড়িতে আরও ছিলেন ছাত্রলীগ কেন্দ্রীয় কমিটির সাহিত্য সম্পাদক মাসুদ আমেদ রুমি, প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের মইনুল ইসলাম আজাদ, হাসানুজ্জামান মনি (জুডো মনি), নাজমুল হাসান জংগি এবং আমি। ২য় গাড়িটি ঢাকা শহর ছাত্রলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক আজিজুল হক চৌধুরী কাওসারের নেতৃত্বে উত্তরাঞ্চলের কর্মীদেরকে নিয়ে এবং ৩য় গাড়িটি ঢাকা শহর ছাত্রলীগের সহ-সভাপতি শেখ আতাউর রহমানের নেতৃত্বে পূর্বাঞ্চলের কর্মীদেরকে নিয়ে একসাথে রওয়ানা হয়। হাসানুল হক ইনু নিজে একটি পিক আপ নিয়ে পিছনে ছিলেন রাসায়নিক জার গুলো পরিবহণের জন্যে। সায়েন্স ল্যাবরেটরির প্রধান ফটকে পৌছে প্রথমেই ওদের ৬জন প্রহরীকে নিরস্ত্র করে গার্ড রুমের মধ্যে পিছমোড়া করে বেধে রাখা হয়। এখানে মাসুদ আহমেদ রুমি ও হাসানুজ্জামান মনিকে পাহারায় রেখে আমরা পরিকল্পনা মতো ভিতরের স্টাফ কোয়ার্টার থেকে বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তাদের ধরে নিয়ে আসি। ওদের দেখানো রাসায়নিক জার/ড্রাম গুলোকে হাসানুল হক ইনুর পিক আপ গাড়িতে এবং কিছু শেখ আতাউরদের গাড়িতে তুলে দেওয়া হয়। এরপর আমরা সবার আগে পিক আপ গাড়িকে রওয়ানা করিয়ে এক এক করে সায়েন্স ল্যাবরেটরি থেকে বের হয়ে আসি। সবার শেষে মাসুদ আহমেদ রুমি ও হাসানুজ্জামান মনিকে মূল ফটক থেকে গাড়িতে তুলে নেওয়া হয়। অত্যন্ত সফল এই অভিযান শেষে দূর্ভাগ্যজনকভাবে বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় এস.এম. হলের কাছে এসে হাসানুল হক ইনুর পিক-আপ গাড়িটি উল্টে যায় এবং রাসায়নিক দ্রব্য থাকায় সাথে সাথে আগুন লেগে সম্পূর্ণ গাড়িটি ভস্মিভূত হয়। চারদিকে পাকিস্তানি আর্মি প্রহরার মাঝখানে সায়েন্স ল্যাবরেটরিতে আমাদের সেদিনকার অভিযানটি ছিল এক রোমাঞ্চকর বিজয়ে অভিযান।

মার্চ মাসের মাঝামাঝি সময়ে এসে পাকিস্তানি সামরিক জান্তাদের সকলের কাছেই পরিস্কার হয়ে উঠে। এসময়ে তারা আকাশ এবং সমুদ্র পথে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে সামরিক সরঞ্জাম ও সেনা সদস্যদের আনতে থাকে, অপরদিকে রাজনৈতিক আলোচনার নামে চলতে থাকে তাদের কালক্ষেপণ। ১৫ই মার্চ প্রেসিডেন্ট জেনারেল ইয়াহিয়া খাঁন তাঁর চুড়ান্ত পরিকল্পনা নিয়ে ঢাকায় আসেন এবং ঢাকায় পৌছে সেদিনই

বিকেলে শুধু মাত্র পশ্চিম পাকিস্তানি উচ্চপদস্হ সামরিক কর্মকর্তাদেরকে নিয়ে রমনা প্রেসিডেন্ট হাউসে এক গোপন বৈঠকে মিলিত হন। বৈঠকে সামরিক কর্মকর্তাদেরকে সামরিক অভিযান পরিচালনার খুটিনাটি দিকগুলোর পরিকল্পনা চূড়ান্ত করার নির্দেশ দেওয়া হয়। অপরদিকে শেখ মুজিবুর রহমানসহ আওয়ামী লীগ নেতাদেরকে ধোঁকায় রাখার উদ্দেশ্যে পরদিন ১৬তারিখ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে প্রেসিডেন্টের সাথে ব্যক্তিগত ভাবে আলোচনার জন্য প্রেসিডেন্ট হাউসে ডাকা হয়। এর পরদিন অর্থাৎ ১৭তারিখ থেকে উভয় পক্ষের মধ্যে দলীয় আলোচনার নামে শুরু হয় প্রহসনমূলক কালক্ষেপণ। ভিতরে ভিতরে জেনারেলরা সামরিক অভিযানের খুটিনাটি পরিকল্পনা এবং প্রস্তুতি নিয়ে ব্যস্ত। ২০শে মার্চ 'অপারেশন সার্চ লাইট'[৭]এর চূড়ান্ত পরিকল্পনা জেনারেলদের হাত ঘুরে ইয়াহিয়া খাঁনের কাছে অনুমোদনের জন্যে দেওয়া হলে এ বিষয়ে পরামর্শের

---

[৭]পাকিস্তানি সামরিক জান্তা, তাদের মতে পূর্ব-পাকিস্তানে শেখ মুজিবের নেতৃত্বে পরিচালিত 'বিদ্রোহ' দমনের উদ্দেশ্যে প্রথমে 'অপারেশন ব্লিৎজ' নামে একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। এই পরিকল্পনার লক্ষ্য ছিলো মার্শাল-ল জারি এবং রাজনৈতিক ও ছাত্র নেতৃবৃন্দকে গ্রেফতার করা। কিন্তু ১ মার্চ ইয়াহিয়া খাঁনের নির্বাচন স্থগিত ঘোষনার পরে, বিশেষ করে দেশের এ অংশে, রাজনৈতিক পরিস্থিতি খুবই উত্তপ্ত হয়ে উঠে। ৭ মার্চ বঙ্গবন্ধুর ভাষনের মধ্য দিয়ে অসহযোগ আন্দোলনের ডাকে পূর্ব পাকিস্তানে কার্যত শেখ মুজিবের শাসন কায়েম হয়। সরকারি বেতার ও টেলিভিশন পর্যন্ত শেখ মুজিবের নির্দেশ মতো অনুষ্ঠানমালা প্রচার করতে াকে। এই পরিস্থিতিতে সামরিক জান্তার কাছে ইতোপূর্বে প্রণীত 'অপারেশন ব্লিৎজ' পরিকল্পনা অকার্যকর হয়ে পড়ে। তাঁরা মনে করেন যে, সামরিক অভিযানের মধ্য দিয়ে প্রথমত শেখ মুজিবের 'বিদ্রোহী কর্তৃত্ব'কে উৎখাত করা এবং দ্বিতীয়ত পূর্ব-পাকিস্তানে সরকারি কতৃত্ব পুণঃপ্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন। ১৭ মার্চ মুজিব-ইয়াহিয়া বৈঠকের পরে সেরাতেই ইয়াহিয়া খাঁন, পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর লেঃ জেনারেল টিক্কা খাঁনের সঙ্গে বৈঠকের বিষয়ে আলোচনা কালে তাঁর পক্ষ থেকে রাজনৈতিক আলোচনায় অগ্রগতির বিষয়ে হতাশা ব্যাক্ত করেন এবং জেনারেল টিক্কা খাঁনকে সামরিক অভিযানের পরিকল্পনা নিয়ে এগিয়ে যেতে বলেন। ১৮ মার্চ লেঃ জেনারেল টিক্কা খাঁনের নির্দেশে জি.ও.সি মেজর জেনারেল খাদিম রাজা ও মেজর জেনারেল রাও ফরমান আলী এই দু'জনে মিলে শুরু করেন অপারেশন সার্চ লাইট পরিকল্পনার কাজ। মেজর জেনারের রাও ফরমান আলী পরিকল্পনার মূল পর্বের খসড়া তৈরী করেন এবং মেজর জেনারেল খাদিম রাজা এই পরিকল্পনার সেনা বন্টন ও দায়িত্ব নির্ধারন অংশের কাজ প্রস্তুত করেন। ২০ মার্চ এই পরিকল্পনা অনুমোদনের জন্যে জেনারেল হামিদ এবং লেঃ জেনারেল টিক্কা খাঁনের কাছে দেওয়া হয়। সামান্য কিছু অংশ সংশোধনের পরে তাঁরা উভয়ে এতে সম্মতি প্রদান করেন। এর পরে পরিকল্পনায় চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্যে এটি প্রেসিডেন্ট ও প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক জেনারেল ইয়াহিয়া খাঁনের কাছে উপস্থাপন করা হয়। ইয়াহিয় খাঁন পরিকল্পনার ১টি অংশ সংশোধনের পরে (যেখানে বলা ছিলো শেখ মুজিবসহ আওয়ামী লীগ নেতাদের প্রেসিডেন্টের সঙ্গে আলোচনার সময়ে গ্রেফতার করা হবে) এটিতে চূড়ান্ত অনুমোদন প্রদান করেন। (পাকিস্তানি সামরিক জান্তার 'অপারশন সার্চ লাইট' পরিকল্পনার অনুমোদিত অংশের বিস্তারিত পরিশিষ্ট'তে সংযোজন করা গেল।)

জন্যে (বাহ্যিকভাবে আলোচনার নাম করে, আওয়ামী লীগের মতামত নিয়েই) জুলফিকার আলী ভুট্টোকে ঢাকায় ডেকে পাঠানো হয়। ২১শে মার্চ পিপিপি'র নেতা জুলফিকার আলী ভুট্টো তাঁর সশস্ত্র দলবল নিয়ে আলোচনার নামে ঢাকায় এসে উপস্হিত হন। যদিও সামরিক অভিযান পরিকল্পনায় প্রেসিডেন্টকে তাঁর মতামত জানানোই ছিল ঢাকা আগমনের আসল উদ্দেশ্য। 'অপারেশন সার্চ লাইট' পরিকল্পনার খুটিনাটি সব কিছু ঠিক হওয়ার পর আক্রমণের চুড়ান্ত নির্দেশ দিয়ে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খাঁন সকলের অজান্তে ২৫শে মার্চ সন্ধ্যায় নাটকীয় ভাবে ঢাকা ত্যাগ করেন। (প্রসংগত উল্লেখ্য যে এই ঘটনার ঠিক দুই বছর পূর্বে ১৯৬৯এর ২৫শে মার্চ এমনি এক সামরিক ফরমান স্বাক্ষরের মধ্য দিয়ে জেনারেল ইয়াহিয়া খাঁন অপর ফিল্ড মার্শাল আইয়ুব খানকে পাকিস্তানের গতি থেকে বিতাড়িত করে পাকিস্তানের ক্ষমতা গ্রহণ করেন)।

২৫শে মার্চের কাল রাতের পর ২৬তারিখ সকালেই জুলফিকার আলী ভুট্টোকে তাঁর সাঙ্গ পাঙ্গসহ হোটেল ইন্টার কন্টিনেন্টাল (বর্তমানে হোটেল শেরাটন) থেকে আর্মি নিরাপত্তা প্রহরায় ঢাকা তেজগাঁও এয়ারপোর্টে এনে করাচিগামী পি.আই.এ.'র বিমানে তুলে দেওয়া হয়। বিমানে উঠার পূর্ব মুহূর্তে গত রাতের মিলিটারি হামলার প্রশংসা করতে গিয়ে ব্রিগেডিয়ার আরবাবের কাছে ভুট্টো মন্তব্য করেন 'খোদাকে ধন্যবাদ, পাকিস্তান রক্ষা পেয়েছে'।[৮] পরে করাচি পৌছেও তিনি দেশি এবং বিদেশি সাংবাদিকদের কাছে একই মন্তব্য করেন।

পাকিস্তানে সামরিক বাহিনীর ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দুতে থাকা তরুণ পাঞ্জাবি অফিসারদের (এদের অধিকাংশই জোতদার পরিবার থেকে আসা) একটা বদ্ধমুল ধারণা ছিল বাঙালি ভীরু জাতি, তাই তাদেরকে ভয় দেখিয়ে একবার বশ মানাতে পারলে আর জীবনে মাথা তুলে দাঁড়াবে না। সে কারণে শুরু থেকেই তারা বার বার সামরিক আঘাত হানার জন্যে চাপ দিয়ে আসছিল এবং ২৫শে মার্চের আগেই তারা 'অপারেশন ব্লিজ' নামে আরও একটি সামরিক অভিযানের পরিকল্পনা চুড়ান্ত করে। ২৫শে মার্চ ইতিহাসের নৃশংসতম হত্যাকান্ড ঘটানোর পর এদেরকেই পরদিন ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট অফিসার মেসে বসে বলতে শোনা যায় 'বাঙালিদেরকে অত্যন্ত উপযুক্ত ভাবে দমন করা হয়েছে, অন্তত আর এক পুরুষ পর্যন্ত কেউ মাথা তুলে দাঁড়াতে সাহস পাবে না।'[৯] অথচ এই নৃশংস হামলার মাত্র ৯ মাসের মধ্যেই কাপুরুষের মত আত্মসমর্পণ করে এদেরকেই চিরতরে পূর্ব পাকিস্তান ছাড়তে হয়।

---

[৮] ও ৯ তথ্য সূত্র 'উইটনেস টু সারেন্ডার' লেখক সিদ্দিক সালিক।

ইয়াহিয়া খাঁনের পলায়ন এবং অপারেশন সার্চ লাইট

১৯৭১-এর ২৫শে মার্চ বিকেলে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খাঁন 'প্রেসিডেন্ট হাউস' থেকে গাড়ির বহর নিয়ে ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট স্টাফ হাউসে তাঁর সম্মানে আয়োজিত এক চা-চক্র অনুষ্ঠানে যোগ দিতে যান। অপরাহ্নে অনুষ্ঠান শেষে সেখান থেকে প্রেসিডেন্টের গাড়ির বহর যথারীতি ফ্লাগ উড়িয়ে প্রেসিডেন্ট হাউসে ফেরত আসেন, তবে ইয়াহিয়া খাঁনের বদলে ব্রিগেডিয়ার রফিককে ড্যামি সাজিয়ে প্রেসিডেন্টের নির্দিষ্ট গাড়ির সিটে বসিয়ে। আসল ইয়াহিয়া খাঁন গোপনে আর একটি ফ্লাগবিহীন জিপ গাড়িতে চেপে ক্যান্টনমেন্ট স্টাফ হাউস থেকে তেজগাঁও বিমান বন্দরের এয়ারফোর্সের গেট দিয়ে বিমান বন্দরে ঢুকে তাঁর জন্য নির্দিষ্ট বিমানে করে সন্ধা ৭টায় চোরেরমত ঢাকা ত্যাগ করেন।' প্রেসিডেন্টের এ রকম নাটকীয় ভাবে পালিয়ে যাওয়ার খবর ঢাকা এয়ারপোর্টের কন্ট্রোলরুমে ডিউটিরত এয়ারফোর্সের বাঙালি অফিসার এবং প্রেসিডেন্ট হাউসের বাঙালি গার্ডদের মাধ্যমে মুহূর্তের মধ্যে ঢাকা শহরে ছড়িয়ে পড়ে।

গত কয়েকদিনের কানা-ঘুষার পর সন্ধ্যায় প্রেসিডেন্টের পালিয়ে যাওয়ার খবর প্রচার হওয়ার পর সামরিক অভিযান সম্পর্কে রাজনৈতিক মহলের সবাই মোটামুটি নিশ্চিত হয়ে যান। সন্ধ্যায় সিরাজুল আলম খান তাঁর ল্যামব্রেটা মোটর সাইকেলে করে ইকবাল হলে এসে আমাদের সবাইকে সরে যেতে বললেন এবং পাড়ায় পাড়ায় গিয়ে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে বললেন। প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মীরা তাৎক্ষণিকভাবে কিছু পেট্রোল বোমা বানিয়ে নিয়ে আসে এবং সেগুলোকে কাজী আরেফ আহমেদ উপস্থিত কর্মীদের মাঝে বিতরণ করে দেয়া ছাড়াও বিভিন্ন আঞ্চলিক শাখায় পৌছে দেয়ার ব্যবস্থা করেন। সেদিন সন্ধ্যা থেকেই শুরু হয় শহরের বিভিন্ন রাস্তায় গাছ কেটে প্রতিবন্ধকতা গড়ে তোলার কাজ। আজিজুল হক চৌধুরী কাওসার, সেলিম ভূঁইয়া এবং আমি সমস্ত শহর ঘুরে প্রস্তুতি প্রত্যক্ষ করে রাতে আবার ইকবাল হলে আসি কিন্তু সেদিন হল একেবারেই ফাঁকা, কোনও নেতাই রাতে আর হলে আসেননি। হল থেকে নীলক্ষেত 'আনোয়ারা রেস্টুরেন্ট'[১০]এ গিয়ে আমাদের কয়েকজন ঘনিষ্ট

---

[১০] ১৯৬৯ থেকে ১৯৭১ এবং স্বাধীনতার পরবর্তীতেও বিশেষ করে জাসদ'র রাজনীতিতে নীলক্ষেত রেল লাইনের (বর্তমানে রাস্তা) পাশে অবস্হিত 'আনোয়ারা রেস্টুরেন্ট'এর গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। আমাদের নিয়মিত আড্ডা এবং যোগাযোগের কেন্দ্র ছিল এই রেস্টুরেন্টটি। দিনে অথবা রাতে যে কোনও সময়ে এসে আমাদের কাউকে না কাউকে এখানে পাওয়া যেতই। এ ছাড়াও বিশেষ প্রয়োজনে এই রেস্টুরেন্টের কাউন্টারে খবর দিয়ে গেলে তারা অত্যন্ত নির্ভরতা এবং বিশ্বস্থতার সঙ্গে সে সব খবর যথাস্থানে পৌছে দিত। সিরাজুল আলম খান এবং আব্দুর রাজ্জাক এরাও জরুরি প্রয়োজনে নেতা, কর্মীদের সাথে যোগাযোগের জন্যে এই রেস্টুরেন্টকে ব্যবহার করতেন।

সহকর্মীকে পেয়ে যাই, ওখানে বসে তার সঙ্গে আলাপ করতে থাকি, এমন একজন উত্তেজিত ভাবে ছুটতে ছুটতে খবর নিয়ে আসে আর্মি ক্যান্টনমেন্ট থেকে বের হয়ে শহরের দিকে আসছে। আমরা দৌড়ে নিউ-মার্কেটের মোড়ে এসে ধানমন্ডির দিকে তাকিয়ে মিলিটারি জিপ গাড়ির হলুদ আলোর সারি দেখতে পাই এবং প্রায় একই সঙ্গে আমাদের কানে অটোমেটিক রাইফেলের গুলির শব্দ ভেসে আসে। পরিস্থিতির ভয়াবহতা বুঝে আমরা বড় রাস্তা ছেড়ে আজিমপুর কলোনির মধ্যে ঢুকে পড়ি এবং মাহমুদুর রহমান বেলায়েতের সঙ্গে তাঁর বোনের বাড়িতে সবাই মিলে (মাসুদ আহমেদ রুমি, জুডো মনি, একরামুল হক, আব্দুল হক, মোশারফ হোসেন, সেলিম ভূঁইয়া এবং আমি) আশ্রয় নেই। সেদিন রাতভর আমরা গোলাগুলির শব্দ শুনে জেগে কাটাই, পরদিন জানালা দিয়ে উঁকি মেরে দেখি রাস্তাঘাট সব একেবারে ফাঁকা, আতংকে সবাই গৃহবন্দি। এরই মধ্যে ফিসফাস করে চারদিকের সব উড়ো খবর আসতে থাকে। বিশ্ববিদ্যালয়, ই.পি.আর. ক্যাম্প এবং রাজারবাগ পুলিশ লাইন গুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে রাস্তায় রাস্তায় লাশ ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে বলেও শোনা যায়। আতংক, উৎকন্ঠা আর অনিশ্চয়তার মধ্য দিয়ে মার্চের ২৬ তারিখ পার হয়ে রাত আসে। রাস্তার পাশের ঘর থেকে উঁকি মেরে আমরা সেনাবাহিনীর ভারি ভারি যানবাহনকে ই.পি.আর. গেটের দিকে যেতে দেখলাম। বি.বি.সি, ভয়েস অব আমেরিকা ও আকাশবাণীর খবর থেকে সামরিক অভিযানের আভাস দেওয়া হয়, ঢাকা বেতার এবং টেলিভিশন বন্ধ। অনেক রাতে থেকে থেকে মর্টার ও কামানের ভারি গোলা আর মেশিনগানের গুলির আওয়াজ পাওয়া যায় এবং শহরের অনেক যায়গায় আগুন জ্বলতে দেখা গেল।

২৭ তারিখ সকালে কয়েক ঘন্টার জন্যে কারফিউ শিথিল করার কথা ঘোষণা করা হলে আমরা সবাই ঘর থেকে বের হয়ে আমি। যেদিকে তাকাই সেদিকে সব ভীত সন্ত্রস্ত মানুষ, কেউ কারও দিকে তাকাতে পর্যন্ত সাহস পাচ্ছে না, অতি চেনা পথও কেমন যেন অচেনা লাগছে, চারদিকে আতংক আর গা ছমছম ভাব। আজিমপুর থেকে বের হয়ে পলাশির মোড়ে গিয়ে দেখলাম এস.এম. হলের পাশ দিয়ে ইকবাল হলে ঢুকার রাস্তায় একটি মিলিটারি জিপ গাড়ি হুড খোলা অবস্থায় ভেতরে কয়েকজন সৈন্য নিয়ে অলস ভাবে দাঁড়িয়ে আছে এবং ওদের পাশ দিয়েই ইকবাল হলের দিকে লাইন করে মানুষ ঢুকছে আর বের হচ্ছে। মানুষজনের ঢুকা এবং বের হওয়া দেখেই মনে হল ভিতরে দেখার মতো কিছু একটা আছে। আমরা নিজেদের নিরাপত্তার কথা বিবেচনা করে একসঙ্গে না থেকে আলাদা হয়ে ভিতরে ঢুকে পড়লাম কিন্তু ভিতরে ঢুকে যা দেখলাম এরজন্যে মোটেও প্রস্তুত ছিলাম না। ইকবাল হলের প্রবেশ মুখেই রাস্তার উপরে ৫-৬টি মৃতদেহ লাইন করে শুইয়ে রাখা হয়েছে। প্রত্যেকের বুক, পেট চিরে শরীরের ভিতরের জিনিসগুলো বের করে লাশের পাশেই রেখে দেওয়া হয়েছে। নৃশংসতা আর নিষ্ঠুরতার এক ভয়ানক উলঙ্গ প্রদর্শনী! এই মৃতদেহগুলোর মধ্যে

চিশতি শাহ হেলালুর রহমানের লাশ দেখে খুবই খারাপ লাগল। ছাত্রলীগ কেন্দ্রীয় কমিটির সহ-সম্পাদক চিশতি শাহ হেলালুর রহমান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সাংবাদিকতা বিভাগে পড়াশুনার পাশাপাশি 'দৈনিক আজাদ' পত্রিকায় কর্মরত ছিলেন। রাতের শিফটে কাজ করে ঐদিন নিজের রুমে এসে শুয়ে পড়েছিলেন, সাবধান করার মতো কারও সাথে হয়ত দেখাই হয়নি অথবা কেউ সাবধান করে থাকলে হয়ত সে সাবধানবাণী আমলেই আনেন নি। যাহোক, এই নির্মম ডিসপ্লে দেখে আমরা বুঝে গেলাম পরিকল্পিত ভাবে আতংক ছড়ানো হচ্ছে, এরপর লিস্ট ধরে এক এক করে রাজনৈতিক নেতা, কর্মীদেরকে খুঁজে বের করা হবে। তাই আর কাল বিলম্ব না করে সবাই যার যার বাড়ির দিকে গেলাম ঘর থেকে বিদায় নেওয়ার উদ্দেশ্যে। আমার সঙ্গে সেলিম ভূঁইয়ার প্রোগ্রাম ঠিক হল ঘন্টা খানেক পরে মতিঝিল মাজার রাস্তার মোড়ে এসে মিলিত হওয়ার। বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা থেকে বের হওয়ার মুখেই আমার এক অরাজনৈতিক বাল্য বন্ধু সৈয়দ আবু মর্তুজার (বাবুল) সঙ্গে দেখা, বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় ছাত্রদেরকে পাখির মতো গুলি করে মেরেছে শুনে সে ছুটে এসেছে আমার খোঁজ নিতে, আমাকে পেয়ে সে জড়িয়ে ধরল। দুইজনে একসঙ্গে বাসার দিকে হাঁটা দিলাম ওর বাসা মালিবাগ বাগান বাড়ি, আমার বাসার কাছেই।

গুলবাগে নিজের পাড়ায় ঢুকতেই বুঝলাম পরিস্থিতি অন্যরকম, পরিবারের সকলেই আমাকে নিয়ে স্বাভাবিক কারণেই উৎকণ্ঠিত ছিলেন। রাজারবাগ পুলিশ লাইনের অনেক পুলিশ প্রায় সারা রাত ধরে এদিক দিয়েই পালিয়েছে এবং পাড়া থেকে প্রায় সকলেই লুঙ্গি ও অন্যান্য কাপড় দিয়ে ওদেরকে সাহায্য করেছে। পালিয়ে যাওয়া এই সব পুলিশের লোকজনের কাছ থেকে ইতোমধ্যে পাক বাহিনীর নিষ্ঠুরতার কথা সকলেই জেনেছে। যাহোক, বাসা থেকে দ্রুত বিদায় নিয়ে চলে এলাম মতিঝিল মাজার-মোড়ে, আসার পথে শাহাবউদ্দিন, কাওসার এবং আল-ফারুখের বাসায় ওদের খবর নিতে গেলাম কিন্তু কারও সাথে দেখা হল না, কোথায় আছে সেটাও সঠিক ভাবে জানা গেল না, সবাই যার যার মতো সরে পড়েছে। মতিঝিল মাজারের পাশে ছাত্রলীগ এবং আওয়ামী লীগ কর্মীদের আড্ডায় এসে কয়েকজনকে পাওয়া গেল এবং শওকত ভাই, চুন্নু ভাই এদের কাছ থেকে ঢাকা শহরের বিভিন্ন এলাকার কথা মোটামুটি জানা গেল। পুলিশ, ই.পি.আর. এবং বাঙালি সেনা সদস্যদের কয়েকস্থানে বিশেষ করে জয়দেবপুরে প্রতিরোধ গড়ে তোলার খবর এখান থেকে পাওয়া গেল। ইতোমধ্যে সেলিম ভূঁইয়া খবর নিয়ে এসেছে আমাদের নেতারা সবাই বুড়িগঙ্গার ওপারে জিঞ্জিরায় ক্যাম্প করেছেন। এদিকে কারফিউ শিথিলের সময় শেষ হয়ে আসছে তাই আমরা দু'জনে আর বিলম্ব না করে জগন্নাথ কলেজ হয়ে জিঞ্জিরা যাওয়ার উদ্দেশ্যে রওয়না হলাম। জগন্নাথ কলেজে এসে কাউকে পেলাম না, ভেবেছিলাম আমাদের কর্মী কাউকে পাওয়া গেলে তার সাহায্যে নদীর ওপারে যাওয়াটা সহজ হবে।

জগন্নাথ কলেজের পেছনে কলেজ শাখার সভাপতি কাজী জাহাঙ্গীর আমীরের বাসা। ওকে বাসায় না পেলেও একটু সামনে গিয়েই পেয়ে গেলাম। ও জানাল আমাদের সব নেতারাই ওপারে জিঞ্জিরায় আছে কিন্তু এখন সেখানে যাওয়াটা নিরাপদ হবে না। খেয়া ঘাটের সামনের রাস্তা দিয়ে কিছুক্ষণ পর পর মিলিটারিরা জিপ গাড়ি চেপে টহল দিচ্ছে আর অবাঙালিরাও অস্ত্র হাতে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই আবার কারফিউ শুরু হবে, তাই জাহাঙ্গীর আমীর আমাদেরকে নিয়ে আর ঘোরা ফিরা না করে শাখারি পট্টির মধ্যে এক পোড়া বাড়িতে তুলে দিল কোনো মতে রাতটা কাটানোর জন্যে। সমস্ত শাখারি পট্টি নিরব নীথর হয়ে আছে। ২৫শে মার্চ রাতেই এখানে হামলা এবং ব্যাপক লুটপাট হয়েছে। মিলিটারির ছত্রছায়ায় অবাঙালিরা এখানে গত ২দিন ধরে অবিরাম লুটপাট করেছে এবং লুটপাট শেষে বাড়ি ঘরে আগুন দিয়ে দিয়েছে। জাহাঙ্গীর আমীর সে কারণেই ধরে নিয়েছে আজ আর কেউ এখানে আসবে না, কেননা; লুটপাট কারিরা ভাল ভাবেই জানে নেওয়ার মতো কিছুই আর অবশিষ্ট নেই, আর এখানকার বাসিন্দারা সবাই ২৫শে মার্চ তারিখেই প্রাণের মায়ায় এলাকা ছেড়ে পালিয়েছে। এত নিখুঁত হিসেবের পরও সমস্ত রাত উদ্বেগ আর উৎকন্ঠার মধ্য দিয়ে জেগেই কাটাই। আশে পাশের বাড়ি ঘরে সারা রাতভরই ছিঁচকে চোরদের আনাগোনা টের পাওয়া যাচ্ছিল, পোড়া জিনিসপত্রের মধ্যেও উল্টে পাল্টে দেখে নিচ্ছিল নেওয়ার মতো অবশিষ্ট কিছু পাওয়া যায় কি না। দূর থেকে রাতভরই গোলাগুলি আর ভারি শেল আওয়াজ ভেসে আসছিল। অনেক রাতে ছাদের উপর থেকে শহরের বিভিন্ন এলাকায় আগুন জ্বলতে দেখা গেল। আশে পাশের এলাকা এবং সমস্ত শহরই যেন কবরের মতো নীরব, বহু দূরের আওয়াজও মনে হচ্ছিল একেবারে কাছে কোথাও।

বাধা দিলে বাধবে লড়াই এ লড়াইয়ে জিততে হবে

২৮শে মার্চ সকালে কারফিউ তুলে নেওয়ার কিছু পরেই আমরা ৩ জন (কাজী জাহাঙ্গীর আমীর, সেলিম ভূঁইয়া এবং আমি) সোয়ারী ঘাট এলাকা দিয়ে খেয়া পার হলাম। ওপারে নেমে খোঁজ করতেই জানা গেল ছাত্র নেতারা সবাই স্থানীয় একটি স্কুলে ক্যাম্প করেছে, এ ছাড়া অনেক স্মরণার্থীও তখন সেই ক্যাম্পে ছিল। রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত লোকজন ছাড়াও গরীব বস্তিবাসি এবং বিশেষ করে সংখালঘু সম্প্রদায়ের লোকেরা পরিবার পরিজন নিয়ে ঢাকার ঘর বাড়ি ছেড়ে গ্রামের বাড়ি এমনকি আত্মীয় স্বজনের বাড়ি অথবা পরিচিত কারও বাড়ির দিকে ছুটে চলেছে প্রাণের ভয়ে আশ্রয়ের আশা নিয়ে। সিরাজুল আলম খান আমাদের সকলের খোঁজ খবর নিচ্ছিলেন এবং যেসকল নেতা-কর্মী তখনও আসে নাই বা যাদের কোনো খোঁজ পাওয়া যায় নাই তাদের সাথে যোগাযোগ করার চেষ্টা হচ্ছিল। যারা এসেছে তাদেরকে নিজ নিজ এলাকায় গিয়ে প্রতিরোধ গড়ে তোলার নির্দেশ দিয়ে পাঠানো হচ্ছিল। বাঙালি পুলিশ, ই.পি.আর. এবং সেনাসদস্য কাউকে পাওয়া গেলে তাদেরকেও প্রতিরোধ সংগ্রামেরসাথে সম্পৃক্ত করে নেওয়ার কথা বিশেষভাবে বলে দেওয়া হচ্ছিল। এ সময় চট্টগ্রাম কালুরঘাট বেতারকেন্দ্র থেকে রেডিওতে প্রচারিত মেজর জিয়াউর রহমানের স্বাধীনতার ঘোষণা শোনা গেল, মনের মধ্যে আত্মবিশ্বাস এবং সাহস দু'টোই ফিরে পেলাম। গত কয়েকদিনের শংকা, উদ্বেগ আর আতংক মুছে ফেলে দিয়ে ফিরে পেলাম গভীর বিশ্বাস 'এ লড়াই চলবে'।

বাবার সরকারি চাকরির সুবাদে ছোট বেলা থেকেই আমরা বাইরে বাইরে থাকায় গ্রামের বাড়ির সঙ্গে আমার তেমন কোনও যোগাযোগই ছিল না। কাজী আরেফ আহমেদ সেটা জানতেন বলে আমাকে উনাদের সঙ্গে থেকে যেতে বললেন কিন্ত আমি সিদ্ধান্ত নিলাম আমার গ্রামের বাড়ি গোপালগঞ্জ গিয়ে সেখানকার প্রতিরোধ সংগ্রামের সঙ্গে যুক্ত হতে। নেতৃবৃন্দের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ এবং টাকা নিয়ে পরদিন সকালে ফরিদপুরের ছাত্রনেতা কবিরুল ইসলাম মাও এর সাথে রওয়ানা হলাম ফরিদপুর হয়ে গোপালগঞ্জ যাব বলে। জিঞ্জিরা থেকে বাসে শ্রীনগর, সেখান থেকে হাঁটা পথে মাওয়া এবং মাওয়া থেকে লঞ্চে ফরিদপুর গিয়ে নামলাম প্রায় সন্ধ্যার সময়। ফরিদপুর পৌছে মাও সেই রাতটুকুর জন্য আমার থাকার ব্যবস্হা করে দিল স্থানীয় ডাক বাংলোতে। ডাকবাংলোয় গিয়ে ছাত্রলীগের সভাপতি নূরে আলম সিদ্দিকিকে পেলাম, উনি ঢাকা থেকে আরিচা হয়ে এখানে এসেছেন দেশের বাড়ি যশোর যাবেন বলে। সেই সময়ের বিশিষ্ট আওয়ামী লীগ নেতা জনাব ওবায়েদুর রহমানও ফরিদপুর ডাক বাংলোতেই ছিলেন এবং সেখান থেকে জেলা প্রশাসনের ওয়ারলেস সেট দিয়ে অন্যান্য এলাকার খোঁজ-খবর ও আওয়ামী লীগ নেতাদের সঙ্গে

যোগাযোগ স্থাপনের চেষ্টা করছিলেন। পরদিন খুব সকালে গোপালগঞ্জ রওয়ানা হওয়ার আগে যতদুর বুঝতে পারলাম ওবায়েদ ভাই স্থানীয় পুলিশ বাহিনী নিয়ে কুষ্টিয়া যাবেন ওখানে প্রতিরোধ সংগ্রামে যোগ দিতে। আমি ফরিদপুর থেকে বাসে টেকেরহাট হয়ে সেখান থেকে লঞ্চে বিকেলে গোপালগঞ্জ গিয়ে পৌছলাম এবং গোপালগঞ্জ পৌছে ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় নেতা ইসমত কাদির গামাসহ স্থানীয় ছাত্র নেতাদেরকে একসাথেই ছাত্রলীগ অফিসে পেলাম। ইতোমধ্যে ঢাকা ও চট্টগ্রামের খবর সকলেই পেয়েছে, সবাই প্রস্তুত হচ্ছে সংগঠিতভাবে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে। আমার থাকার ব্যবস্থা হল ছাত্রলীগ জেলা শাখার সভাপতি সরদার জাকির হোসেন খসরুর বাসায়।

গোপালগঞ্জ কায়েদ আযম কলেজ (বর্তমানে বঙ্গবন্ধু কলেজ) মাঠে রোজ ট্রেনিং চলছে একজন অবসরপ্রাপ্ত সামরিক অফিসার এবং স্থানীয় পুলিশ সদস্যের নেতৃত্বে। ছাত্রলীগের সদস্য ছাড়াও অনেক উৎসাহি ছাত্র-যুবক সবাই প্রতিদিন ট্রেনিং নিচ্ছিল, এছাড়া গোপালগঞ্জ শহরের বাইরেও কয়েক জায়গায় ট্রেনিং ক্যাম্প খোলা হয়। স্থানীয় ছাত্র নেতারা সবাই সাংগঠনিক যোগাযোগের কাজে ব্যস্ত। রাত দিন ছুটাছুটি করে অক্লান্তভাবে কাজ করে চলেছেন জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক মাহবুবুর রহমান (পরবর্তীতে পাক বাহিনীর হাতে ধরা পড়ার পর নির্মম অত্যাচারে শাহাদত বরণ করেন, একই সঙ্গে পাক বাহিনীর সদস্যারা সরদার জাকির হোসেন খসরুকেও ধরে নিয়ে যায় এবং চরম নির্যাতনের পর মৃত ভেবে গলায় দড়ির ফাঁস লাগানো অবস্থায় মধুমতি নদীতে ফেলে দেয় কিন্তু সেখান থেকে অলৌকিক ভাবে উনি বেঁচে যান), এ ছাড়াও কলেজ সংসদের সাধারণ সম্পাদক লুৎফর রহমান বাচ্চু কলেজ মাঠের ট্রেনিং ক্যাম্প পরিচালনার সার্বিক দায়িত্ব নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন।

এ সময় ছাত্রলীগের জহিরুল আলম বাবর, মিরাজ খান ঠাকুর, হাফিজুর রহমান মুকুল গোপালগঞ্জ সদর ট্রেজারি থেকে স্থানীয় ছাত্র নেতা এবং প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের সহায়তায় কিছু রাইফেল, গ্রেনেড ও গোলা বারুদ নিয়ে অবসরপ্রাপ্ত সামরিক অফিসার ক্যাপ্টেন নুরুদ্দোহার পরিচালনায় কাশিয়ানী থানার রাতইল হাই স্কুলে একটি ট্রেনিং ক্যাম্প স্থাপন করেন। ইতোমধ্যে ২৫শে মার্চে ঢাকায় পৈশাচিক হামলার পর দেশের অন্যান্য এলাকা থেকেও (যেখানে যেখানে পাকিস্তানি আর্মিরা ঘাঁটি করেছে) একই রকম আগ্রাসন এবং অত্যাচারের খবর আসতে থাকলে ভীত সন্ত্রস্ত গ্রামবাসি ছাত্রনেতাদেরকে ক্যাম্প গুটিয়ে ফেলতে অনুরোধ করেন। এ সময়ে জহিরুল আলম বাবর ও মীরাজ খান ঠাকুর ট্রেনিং ক্যাম্পের অস্ত্র নিয়ে গোপালগঞ্জ চলে আসেন এবং আওয়ামী লীগ নেতা ডা. ফরিদ আহমেদের নির্দেশে অস্ত্রগুলো প্রতিরোধ সংগ্রামের জন্যে কুষ্টিয়া থেকে অস্ত্র সংগ্রহ করতে আসা জনৈক প্রশাসনিক কর্মকর্তার লঞ্চে তুলে দেন।

এদিকে আমি আর সরদার জাকির হোসেন খসরু রোজ সকালে থানা হেলথ প্রজেক্টের মোটর সাইকেল নিয়ে একটি ২২বন্দুক ঘাড়ে করে মানিকদাহ এবং মোল্লারহাট এলাকায় মধুমতি নদীর পাড়ে ফেরিঘাটে যাই মিলিটারিদের চলাচলের খবর সংগ্রহের উদ্দেশ্যে। খুলনা বা যশোর থেকে যারা আসছে তাদের কাছ থেকে মিলিটারি সম্পর্কে খোঁজ খবর নিয়ে ওদের মুভমেন্ট বুঝার চেষ্টা করি। পরিস্থিতি পর্যালোচনা এবং ভবিষ্যত কর্মপদ্ধতি নির্ধারণের জন্যে প্রতিদিন আওয়ামী লীগ, ছাত্রলীগসহ অন্যান্য স্বাধীনতাপন্থী দলগুলোর এবং প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের নিয়মিত

বৈঠক বসে। আওয়ামী লীগ গোপালগঞ্জ শাখার সভাপতি এবং বঙ্গবন্ধুর একান্ত ঘনিষ্ঠ অগ্রজতুল্য ডা. ফরিদ আহমেদ, সাধারণ সম্পাদক নাজির আহমেদ তালুকদার, আব্দুল লতিফ (পরবর্তীতে পাকিস্তানি বাহিনীর হাতে শাহাদত বরণ করেন), কামরুল ইসলাম রইস, আক্তার উদ্দিন মোক্তার, নূরুল কাদের জুনু, গোলজার চৌধুরী ও জেলা ন্যাপের বাবু কমলেশ, ওলিউর রহমান লেবু এবং অন্যান্য নেতারা দিন-রাত প্রশাসনিক কাজ, ভবিষ্যত কর্মপদ্ধতি, অন্যান্য জেলার সঙ্গে যোগাযোগ ইত্যাদি নিয়ে ব্যস্ত। এর মধ্যে প্রতিরোধ সংগ্রামের জন্যে, কুষ্টিয়া থেকে একজন প্রশাসনিক কর্মকর্তা অস্ত্র এবং গোলাবারুদের সাহায্যের আবেদন নিয়ে একটি লঞ্চসহকারে গোপালগঞ্জ এসে উপস্থিত হন। আগেই বলা হয়েছে, ডা. ফরিদ আহমেদের নির্দেশে জহিরুল আলম বাবর এবং মিরাজ খান ঠাকুরের সংগ্রহে থাকা (কাশিয়ানী ক্যাম্প পরিচালনার) গোপালগঞ্জ পুলিশের বেশ কিছু অস্ত্র এবং গোলাবারুদ সেই লঞ্চে তুলে দেওয়া হয়।

এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি মধুমতি নদীর পাড়ে টহল দেওয়ার সময় খুলনা থেকে পালিয়ে আসা এক ই.পি.আর. সদস্যের কাছ থেকে আমরা নির্ভরযোগ্য খবর পেলাম পাকিস্তানি আর্মি শিগগিরই গোপালগঞ্জ আসার প্রস্তুতি নিচ্ছে। আমাদের মধ্যেও টানটান উত্তেজনা শুরু হয়ে গেল, অনেকেই যার যার নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় শহর ছেড়ে আরও ভিতরে নিজ গ্রামের বাড়িতে চলে গেলেন। আমিও এ সময়ে শহরের নিকটেই আমাদের গ্রামের বাড়ি ভেন্নাবাড়ি গ্রামে চলে এলাম। ইতোমধ্যে ঢাকায় পাড়ায় পাড়ায় আর্মিদের অভিযান শুরু হওয়ায় নিরাপত্তার কথা বিবেচনা করে বাবা পরিবারের সবাইকে নিয়ে ঢাকা থেকে নৌকায় করে দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে গ্রামে চলে এসেছেন।

এপ্রিল মাসের শেষ দিকে গোপালগঞ্জ শহরে পাকিস্তানি আর্মি এসে শহরের একটু বাইরে ওয়ারলেস স্টেশনে তাদের ঘাঁটি স্হাপন করে। ভীত সন্ত্রস্ত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোকেরা প্রাণের ভয়ে পরিবার পরিজন নিয়ে দলে দলে ভারতের উদ্দেশ্যে ঘর-বাড়ি, বিষয়-আশয় সব ছেড়ে পালাতে লাগল। আমাদের এলাকা ছাড়াও আশেপাশের গ্রাম এমনকি অন্যান্য জেলার হাজার হাজার লোক দিনে রাতে অনবরত এদিক দিয়ে খুলনা-যশোর হয়ে ভারতে আশ্রয়ের আশায় ছুটে যাচ্ছে।

ইতোমধ্যে মিলিটারিরা গোপালগঞ্জ শহরে প্রাথমিক ভাবে নিজেদের অবস্হানকে গুছিয়ে নিয়ে স্হানীয় মুসলিম লীগের দালালদের সহায়তায় আশেপাশের গ্রামে হামলা ও লুটপাট শুরু করেছে। আওয়ামী লীগ, ছাত্রলীগ, ন্যাপ ও সংখ্যালঘুদের সহায় সম্বল লুটপাট করে ঘর, বাড়ি এমনকি গ্রামসহ আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দিচ্ছে। প্রায় প্রতিদিনই আশেপাশের গ্রামগুলোর বাড়ি ঘরে আগুন জ্বলতে দেখা যেতো এবং প্রাণভয়ে ভীত মানুষের আর্তচিৎকার ভেসে আসত। আমার ছোট ভাই শেখ মোহাম্মদ সাইদ হোসেন পূর্ব বাংলা সর্বহারা পার্টির একজন সক্রিয় কর্মী ছিল, তার দলের সাথে যোগাযোগ

হওয়ায় একদিন সে রাতের বেলায় মাদারীপুর, বরিশাল অঞ্চলে অবস্থিত তাদের ঘাঁটিতে চলে গেল। আমিও এ সময়ে বাড়ির আশেপাশের লোকদের কানা ঘুষায় গ্রামে থাকাটা নিরাপদ বোধ করছিলাম না, কিন্তু ছোট ভাই সকলের অজান্তে চলে যাওয়ায় নিজেদের লোকেরাই আমাদেরকে বেশ একটু সন্দেহের চোখে দেখছিল। তাই, পরিবারের অন্যান্যদের নিরাপত্তার কথা ভেবে সবার সামনে দিয়েই যাওয়া ঠিক করলাম। যাওয়ার দিন মানসিক চাপে বাবা অসুস্থ হয়ে বিছানায় পড়ে রইলেন। মা এলেন নৌকা ঘাট পর্যন্ত, আশে পাশের বাড়ির মহিলারাও এলো, মা সকলকে শুনিয়ে বেশ জোরে জোরে আমাকে বলতে লাগলেন ঢাকার বাসায় কোথায় চাল, ডাল, কাপড়-চোপড় ইত্যাদি আছে। ঘরের এবং আলমারির চাবির একটি গোছাও আমাকে দিলেন, এ ভাবে সবার চোখের সামনে দিয়ে নৌকায় করে মানিকদাহ লঞ্চ ঘাটে এলাম। আমাকে লঞ্চ ঘাটে নামিয়ে গ্রাম থেকে আসা নৌকাটি ফেরত যাওয়ার পর সোজা উঠে পড়লাম খুলনার লঞ্চে, উদ্দেশ্য খুলনা হয়ে ভারতে পাড়ি জমানো।

খুলনায় গিয়ে উঠলাম আমার স্কুল জীবনের বন্ধু রফিকুল আবেদিন লাভলু'র বাসায়, ওদের বাসাটা ছিল খুলনা শহরের বাইরে খালিশপুর পোস্ট অফিস কলোনিতে। ছাত্র-রাজনীতির সঙ্গে ওর কোনো সম্পৃক্ততা ছিল না। খেলাধূলার সঙ্গে জড়িত থাকার কারণে ওর সাথে খুলনার বিভিন্ন স্তরের লোকজনের পরিচয় ছিল, আমার উদ্দেশ্য ছিল লাভলুর ওখান থেকে খোঁজ-খবর নিয়ে ভারতের দিকে পাড়ি জমানো। লাভলু ওর বন্ধু-বান্ধবদের মাধ্যমে কয়েকদিন খোঁজ নেওয়ার পরে জানা গেল খুলনার স্থানীয় সব ছাত্র নেতারা ইতোমধ্যেই ভারতে পাড়ি জমিয়েছে। অবশেষে লাভলুই আমাকে ভারতে পৌঁছে দেওয়ার জন্যে এক লোক ঠিক করে দিল, সেই লোক নিয়মিত ভারত থেকে মালামাল আনা নেওয়া করে। লোকটির সাথে ওপারে ভারতে পৌঁছে দেওয়ার খরচ বাবদ ১৫০টাকা এবং যাওয়ার দিনক্ষণ ইত্যাদি ঠিক করা হল।

পরনে বিছানার নিচে রেখে কোঁচকানো পাজামা এবং পাঞ্জাবি, পকেটে চিরুনি রুমাল ও টুপি, পায়ে পুরানো ক্ষয়ে যাওয়া স্পঞ্জের স্যান্ডেল, মাথায় চপচপে করে তেল দিয়ে খুব সকালে লাভলুদের বাসা থেকে বের হলাম। যাওয়ার পথে খুলনা কালীবাড়ি বাজার থেকে ১ টিন কেরোসিন তেল কিনে রূপসা লঞ্চ ঘাট থেকে আশাসুনির লঞ্চে উঠলাম। কেউ জিজ্ঞেস করলে বলতে হবে গ্রাম থেকে তেল কিনতে এসেছি। আগের দিন গ্রামের নাম ধাম রিহার্সেল দেওয়াতে গিয়ে কিছুতেই স্থানীয় উচ্চারণ পারছি না দেখে অবশেষে সঙ্গের লোকটি বুদ্ধি দিল 'চুপচাপ বোবা সেজে বসে থাকবেন যা বলার আমিই বলব'। লঞ্চের ছাদে গিয়ে ওর কথা মতো তেলের টিন

সামনে নিয়ে বসে রইলাম। লঞ্চ ছাড়ার কিছু আগে কয়েকজন সশস্ত্র রাজাকার[১১] লঞ্চটা ঘুরে দেখে গেল, একজন এসে আমার তেলের টিনটা নাড়া দিয়ে দেখল, ওরা নেমে যেতেই লঞ্চ ছেড়ে দিল আমিও হাফ ছেড়ে আশে পাশের দৃশ্য দেখে সময় কাটাতে লাগলাম।

কিন্তু কিছুদুর যেতেই চমকে উঠলাম লাভলুদের পাশের দালানের ক্লাস সেভেনে পড়া মোহাম্মদ দুলালকে একই লঞ্চে দেখে, সেও নির্বিকার ভাবে আমাকে না দেখার ভান করে লঞ্চের রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে রইল। যাহোক ঘন্টা চার যাত্রার পর লঞ্চ আমাদের নির্দিষ্ট ঘাটে এসে ভিড়লে সংগের লোকের ইসারায় কেরোসিন তেলের টিন নিয়ে নেমে এলাম, দুলালও আমাদের পিছে পিছে নেমে এল। একটু ফাঁকা যায়গায় এসে জিজ্ঞেস করে জানাল সে আমার সঙ্গে ভারতে গিয়ে ট্রেনিং নিয়ে যুদ্ধ করবে এবং আমি যদি সঙ্গে না নেই তবে সে একা-একাই ভারতের পথে হাঁটা দেবে। দেখলাম আরেক বিপদ, ওর বাবা মা ইতোমধ্যে নিশ্চয় জেনেছেন যে, সে আমার সঙ্গে চলে এসেছে। তাই, আর কথা না বাড়িয়ে ওকে আমার সঙ্গেই নিয়ে নিলাম। সঙ্গের গাইড লোকটির সাথে ওর বিষয়েও রফা করতে হল, কেননা; ওর সাথে দরদাম ঠিক হয়েছিল শুধু আমাকে পার করার জন্যে। কিছুদূর হাটার পর এক দোকানে কেরোসিন তেলের টিন জমা রেখে আমাদেরকে সাইকেলে উঠানো হল, স্হানীয় ভাষায় এর নাম 'হেলিকপ্টার'। গ্রাম্য মাটির রাস্তা দিয়ে ঘন্টাখানেক এই 'হেলিকপ্টারে' চড়ার পর এক নদীর পাড়ে আমাদেরকে ঝুপড়ি ঘরে বসিয়ে সঙ্গের লোকটি গেল খবর আনতে। ভীষণ শিহরণ অনুভব করছিলাম। কেননা, বুঝতে অসুবিধে হচ্ছিল না নদীর ওপারেই ভারত, ঝুপড়ি ঘর থেকেই বি.এস.এফ. ক্যাম্প এবং ভারতীয় জওয়ানদের দেখা যাচ্ছিল। পারাপারের নৌকা ঠিক করে সঙ্গের লোকটি ফিরে এল এবং টাকা পয়সা বুঝে নিয়ে নৌকায় তুলে দিয়ে সে আমাদের কাছ থেকে বিদায় নিল। এতক্ষণ দৃষ্টি ছিল সামনের অজানা পথের দিকে, এখন মাঝ নদীতে এসে কেমন যেন এক শুন্য অনুভূতি নিয়ে ফিরে তাকালাম জন্মভূমির দিকে, আর কি ফেরা হবে? এই কি শেষ বিদায়?

---

[১১] পাকিস্তানি সামরিক শাসকরা ২৫শে মার্চের পরে আনসার, পুলিশ ও ই.পি.আর.'র কাছ থেকে অস্ত্র কেড়ে নেয় এবং বাঙালী প্রশাসন ব্যবস্থাকে সম্পূর্নরুপে ভেঙে দেয়। এই ব্যবস্থাগ্রহণের ফলে যে প্রশাসনিক শুন্যতার সৃষ্টি হয় সেটি পূরনের জন্যে তাঁরা অবাঙালি ও সরকার সমর্থিত স্থানীয় রাজনৈতিক দালালদের সমন্বয়ে 'রাজাকার বাহিনী' নামে একটি সশস্ত্র বাহিনী গড়ে তুলে।

বল বীর- বল উন্নত মম শীর!

নদী পার হয়ে ভারতে পৌঁছে জানলাম শহরটির নাম 'টাকি'। অসংখ্য স্মরণার্থীর আগমনে ইতোমধ্যেই যত্রতত্র থাকা খাওয়ার প্রচুর বেড়ার রেস্টুরেন্ট গড়ে উঠেছে, এমনই একটি রেস্টুরেন্টে গিয়ে ঢুকলাম খাওয়ার জন্যে। খাওয়ারপরে ওখানেই একটি চকি ভাড়া করলাম বিশ্রাম নেওয়ার জন্যে, দুলালকে বিশ্রাম নিতে বলে হোটেল ম্যানেজারের কাছ থেকে এদিককার খোঁজ খবর নেওয়ার চেষ্টা করলাম। হোটেল ম্যানেজার জানাল এদিকে মুক্তি বাহিনীর ক্যাম্প আছে কিন্তু তার জানামতে জয়বাংলার ছাত্র নেতারা সবাই আগরতলাতে আছেন। টাকি থেকে আগরতলার দুরুত্ব এবং পথ খরচের হিসেব করে বিশ্রামের চিন্তা মাথা থেকে উধাও হয়ে গেল। পথ খরচের যা কিছু টাকা সঙ্গে নিয়ে রওয়ানা দিয়েছিলাম দু'জনের ভাড়া গুনতে গিয়ে তাও প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। দোকানে বসে বাইরে মানুষের আনাগোনা দেখছি আর ভাবছি কী করা যায়। এমন সময় আমাদেরই বয়সী একটু ভারী গড়নের একজন এসে আমার পাশে বসল এবং আমার পরিচয়, কোথা থেকে এসেছি ইত্যাদি খোঁজ খবর নিল। চেনা চেনা লাগছে, জিজ্ঞেস করতেই ওর পরিচয় দিল ছাত্রলীগ খুলনা শাখার সভাপতি নজরুল ইসলামের ছোট ভাই বলে। এরপর সে জানাল ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীদের রিক্রুট করার জন্যেই সে বর্ডারে আছে। ওর কাছ থেকে খবর পাওয়া গেল সারা দেশ থেকে ছাত্রলীগের বিভিন্ন স্তরের নেতা-কর্মীদের নিয়ে বি.এল.এফ. (বাংলাদেশ লিবারেশন ফোর্স, 'মুজিববাহিনী' নামে সকলের কাছে পরিচিত) নামে আলাদা একটি বাহিনী গড়ে তোলা হয়েছে এবং এ অঞ্চলের দায়িত্বে আছেন তোফায়েল ভাই, তিনি এখন কলকাতাতেই আছেন। সিরাজুল আলম খান, আ স ম আব্দুর রব এবং ঢাকার দিক থেকে যারা এসেছেন তারা আগরতলাতে আছেন। তোফায়েল ভাইয়ের সঙ্গে আগামীকালই দেখা হতে পারে বলে জানাল। একটু আগের দুর্ভাবনা সব উধাও হয়ে মনে অদম্য সাহস আর শক্তি ফিরে পেলাম, মনে হচ্ছিল এখনই ঢাকায় ফিরে গিয়ে মিছিল বের করি 'স্বৈরাচার নিপাত যাক'।

অনেক্ষণ কথা বলার পর সে চলে গেল, যাওয়ার আগে অবশ্য আমাদের রাতের খাওয়া এবং থাকার ব্যবস্হা করে গেল, কিছু টাকা দিয়ে যেতে চাইলেও নিলাম না। ঠিক হল পরদিন সকালে এসে আমাদেরকে নিয়ে ট্রেনে করে কলকাতায় তোফায়েল ভাইয়ের কাছে নিয়ে যাবে। ও চলে যাওয়ার পর খাওয়া-দাওয়া করে বিছানায় শুয়ে অনেক্ষণ ঘুমাতে পারলাম না। এক অস্বাভাবিক পরিস্হিতির মধ্যে বিদেশের মাটিতে শুয়ে বাবা, মা, ভাই, বোনসহ প্রিয়জনদের কথা এবং বিগত দিনের ঘটনাগুলো ছবির মতো একের পর এক চোখের সামনে দিয়ে ভেসে বেড়াতে লাগল।

দুপুরের দিকে কলকাতা পৌছে তোফায়েল ভাইয়ের সাথে দেখা, দেখা হতেই উনি জড়িয়ে ধরলেন এবং দেশের খবর বিস্তারিতভাবে জানতে চাইলেন, আমিও এদিককার খবর জানার জন্যে উদগ্রীব হয়ে আছি। এক এক করে উনার কাছ থেকে আমাদের বি.এল.এফ-এর কে কোথায় আছে এবং কোথায় ট্রেনিং চলছে সব জানা গেল। তোফায়েল ভাই প্রস্তাব দিলেন উনার সাথে থাকার জন্যে কিন্তু আমি ব্যাকুল হয়ে আছি ট্রেনিং নিয়ে দেশে ফিরে যুদ্ধ করব বলে। আমার আগ্রহ দেখে তোফায়েল ভাই আর বিশেষ জোর করলেন না, পরদিনই আমাদের শিলিগুড়ি পাংগা ক্যাম্পে যাওয়ার ব্যবস্হা করার জন্যে বলে দিলেন। সমস্যা দেখা দিল দুলালকে[১২] নিয়ে, এত ছোট যে ওকে ট্রেনিংএর জন্য পাঠাতে চাইছিলেন না, সেও মরিয়া, ট্রেনিং নেবে এবং যুদ্ধ করবে। ওর নাছোড় বান্দা অবস্হা দেখে তোফায়েল ভাই নিজে ক্যাম্প ইনচার্জের কাছে চিঠি লিখে দিলেন ওর ট্রেনিংএর ব্যবস্হা করার জন্যে।

বি.এল.এফ. (মুজিব বাহিনী)'র পক্ষ থেকে বাংলাদেশে গেরিলাযুদ্ধ পরিচালনার জন্যে ছাত্রলীগের চার নেতার নেতৃত্বে সারা দেশকে মোট চারটি অঞ্চলে ভাগ করে অস্থায়ীভাবে ভারতে আঞ্চলিক সদর দফতর স্হাপন ও পরিচালনা করা হয়।

পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ড: অধিনায়ক- শেখ ফজলুল হক মনি। সহ অধিনায়ক -আ স ম আব্দুর রব ও চট্টগ্রামের আব্দুল মান্নান। পূর্বাঞ্চলের অধিনে জেলাসমূহ -ঢাকা, কুমিল্লা, নোয়াখালী, চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রাম। এই কমান্ডের সদর দফতর ছিল ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের রাজধানী আগরতলায়।

উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ড: অধিনায়ক- আব্দুর রাজ্জাক। সহ অধিনায়ক- শাজাহান সিরাজ। এই কমান্ডের অধিনে জেলাসমূহ- ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল ও সিলেট। কমান্ড সদর দফতর ছিল ভারতের মেঘালয় রাজ্যের তুরা।

উত্তরাঞ্চলীয় কমান্ড: অধিনায়ক- সিরাজুল আলম খান। সহ অধিনায়ক-মনিরুল ইসলাম (মার্শাল মনি)। এই কমান্ডের অধিনে জেলাসমূহ -রাজশাহী, রংপুর,

---

[১২] এই মো: দুলাল পরবর্তীতে ট্রেনিং সমাপ্ত করার পর দেশে ঢুকে সাতক্ষীরা এলাকায় অপারেশন চালাতে গিয়ে রাজাকার বাহিনীর হাতে ধরা পড়ে। অল্প বয়সের কারণে তাকে মেরে না ফেলে জেলে দেওয়া হয় এবং দেশ স্বাধীন হওয়ার পর সে জেল থেকে মুক্তি পায়। পরবর্তীতে একজন ভালো হকি খেলোয়াড় হিসেবে একসময় সে বাংলাদেশ জাতীয় হকি দলে গোলরক্ষকের দ্বায়িত্বও পালন করে। '৮০-র দশকে সৌদি আরবে চাকুরিরত থাকা অবস্হায় এক মর্মান্তিক সড়ক দুর্ঘটনায় তরুণ বয়সে এই বীর মুক্তিযোদ্ধার অকাল মৃত্যু ঘটে।

দিনাজপুর ও পাবনার সিরাজগঞ্জ মহকুমা। কমান্ড সদর দফতর ছিল ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের শিলিগুড়ি শহরের পাংগায়।

পশ্চিমাঞ্চলীয় কমান্ড: অধিনায়ক তোফায়েল আহমেদ। সহ অধিনায়ক -কাজী আরেফ আহমেদ ও নূর আলম জিকু। পশ্চিমাঞ্চলের অধিনে জেলাসমূহ -যশোর, খুলনা, ফরিদপুর, বরিশাল, কুষ্টিয়া ও পাবনা (সিরাজগঞ্জ ছাড়া)। কমান্ড সদর দফতর ছিল ভারতের পশিচমবঙ্গের রাজধানী কলকাতা শহরের ব্যারাকপুরে।

ভারতে বি.এল.এফ'এর সামরিক প্রশিক্ষণ শিবির ছিল দু'টি। একটি ভারতীয় সামরিক একাডেমির অধিনে উত্তর প্রদেশের দেরাদুনের পাশে তান্দুয়ায় এবং অপরটি অসম রাজ্যের হাফলঙে।

আমরা তান্দুয়া ট্রেনিং সেন্টারে যাওয়ার সময় তখনও কলকাতা ক্যাম্পের কাজ শুরু না হওয়ায় আমাদেরকে ট্রেনিংএ পাঠানোর প্রয়োজনিয় ব্যবস্থার জন্যে উত্তরাঞ্চলীয় কমান্ড সদর দফতর শিলিগুড়ি ক্যাম্পে পাঠানো হয়।

শিয়ালদা স্টেশন থেকে শিলিগুড়ি যাওয়ার পথে ফারাক্কায় রেলওয়ের ফেরিতে একদল মুক্তিবাহিনীর সঙ্গে দেখা হল। ওদের মধ্যে মালিবাগের পরিচিত এক ছেলেকে পেলাম, ওরা বিহারে সংক্ষিপ্ত সামরিক ট্রেনিং শেষ করে কেবল মাত্র বর্ডারের দিকে যাচ্ছে দেশে ঢুকবে বলে। বিহারের রোদ-গরমে শরীর পুড়ে কাল হয়ে গেছে কিন্তু চেহারায় ফুটে উঠেছে প্রচন্ড আত্মবিশ্বাস আর দেশে ফেরার আনন্দ। আমি মাত্র কয়েকদিন আগে দেশ থেকে এসেছি শুনে সবাই আমাকে ঘিরে ধরল দেশের অবস্হা খুটিয়ে জানার জন্যে, আমিও ওদের ট্রেনিং এর বিষয়ে জেনে নিলাম। ব্যাপক সংখ্যায় ট্রেনিং দেওয়া হচ্ছে জেনে খুব ভালো লাগল সেই সঙ্গে দেরিতে আসার জন্যে নিজেকে ছোট আর অপরাধী মনে হচ্ছিল। ফারাক্কা পার হয়ে আবার ট্রেনে চেপে পরদিন ভোরে শিলিগুড়ি স্টেশনে নামলাম। আগেই খবর দেওয়া ছিল, স্টেশনের বাইরে দাঁড়ানো মিলিটারি গাড়ির কাছে গিয়ে পরিচয় দিতে ওরা আমাদেরকে তুলে নিয়ে ক্যাম্পের উদ্দেশ্যে গাড়ি ছেড়ে দিল। সে সময়ে এদিকটায় নক্সালদের খুব প্রভাব ছিল। তাই, আমাদেরকে বিশেষ ভাবে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছিল যেন অপরিচিত কারও সঙ্গে আলাপ না করি এবং অহেতুক ঘোরা-ফেরা না করি।

শহর থেকে বেশ খানিকটা দূরে এক বিরান উপত্যকায় আমাদের ক্যাম্প করা হয়েছে। সারি সারি ৮/১০টি তাবু, এর ৪/৫টিতে ভারতীয় সেনা সদস্যরা থাকে বাকি গুলোতে আমাদের ছেলেরা। এখানে এসে মনে হল এতদিন পরে যেন নিজ পরিবারে ফিরে এলাম, সবাই পরিচিত মুখ, ছাত্রলীগের সমমনা কর্মী। এদের মধ্যে কয়েকজন সদ্য ট্রেনিং নিয়ে এসেছে আবার কিছু জড়ো করা হচ্ছে পরবর্তি ব্যাচে ট্রেনিংএ

পাঠানোর জন্যে। এখানে আমাদের তেমন কোনও কাজ ছিল না, ঘুরে ফিরে গল্প-গুজব করেই সময় কাটছিল। আমরা যাওয়ার ২/৩দিন পরেই সিরাজুল আলম খান এলেন আমাদেরকে ট্রেনিংএ পাঠানোর ব্যবস্হা ঠিক করে। ক্যাম্পের দায়িত্বে ছিলেন মার্শাল মনি আর হিসাব এবং কাগজপত্র সব রাখতেন ছাত্রলীগের বিশিষ্ট কর্মী আমিনুল হক (আমিন) এবং তাঁর এই কাজের সূত্রে তিনি সকলের কাছে 'বড়বাবু' নামে পরিচিত ছিলেন।

বড় বড় তাঁবুর নিচে মাটিতে খড় বিছিয়ে তার উপরে তেরপাল পেতে একেকটি তাঁবুতে আমাদের ১৫/২০ জন করে থাকার ব্যবস্হা। তেরপালের নিচে আমরা ইট দিয়ে নিতাম বালিশের প্রয়োজন মিটাতে। ক্যাম্পের পাশেই পাহাড়ী ঝরনা, আমাদের গোছল, কাপড় ধোয়াসহ সবরকম পানির কাজ ঐ ঝরনার পানিতেই সারতে হত। ঝরনার ওপাশে উঁচু সমতল জমিতে একটি চা কোম্পানির নিজস্ব বিমান অবতরণ ক্ষেত্র ছিল, সপ্তাহে ২দিন ওদের বিমান এসে নামত প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র নিয়ে এবং এখান থেকে ওদের বাগানের চা পাতা নিয়ে যেত। রোজ সকালে সূর্য উঠার ঠিক আগে আমরা মনোরম সুন্দর দৃশ্য দেখার জন্যে উন্মুখ হয়ে থাকতাম, সূর্যের প্রথম সোনালী আলো হিমালয়ের বরফের চূড়ায় পড়ে মনে হতো আকাশে একটি সোনালী মুকুট ভাসছে। আকাশে মেঘ বা কুঁয়াশা না থাকলে আমরা কেউই এই অপূর্ব দৃশ্য দেখতে ভুলতাম না। ২/৩দিন পর পর আমাদের একটি আবশ্যকীয় কাজ ছিল তাঁবু পরিস্কার করা। নিচের খড়গুলো উল্টে পাল্টে নিতাম, কেননা; পাহাড়ী জায়গায় বিছানা নিয়মিত নাড়াচড়া না দিলে খড়ের নিচে সাপ বাসা করে ডিম দিত। প্রথম দিকে সাপের কিছু ডিম পাওয়া গেলেও পরবর্তীতে নিয়মিত খড় উলট-পালট করা হতে থাকলে সাপের এই উপদ্রব আর থাকেনি।

এভাবে ৮/১০দিন অলস সময় কাটানোর পর অবশেষে আমাদের প্রতীক্ষার অবসান হল, ট্রেনিং ক্যাম্পে যাওয়ার দিনক্ষণ জানিয়ে দেওয়া হল এবং সেই মতে আমরা আবার সামরিক গাড়িতে করে জলপাইগুড়ি বাগডোগরা সামরিক বিমান ঘাঁটিতে এলাম। এখান থেকে সামরিক পরিবহণ বিমানে করে আমাদেরকে দেরাদুন ট্রেনিং ক্যাম্পে নিয়ে যাওয়া হবে। বিমান আগরতলা থেকে আমাদের কর্মীদের নিয়ে মোটামুটি ভর্তি হয়েই এসেছে, এখান থেকে আমরা মাত্র ১৫জনের মতো উঠলাম। বড় সামরিক পরিবহণ বিমানে আমরা প্রায় ৩০০ জনের উপরে যাত্রী, সবাই গুটি-গুটি হয়ে মেঝেতে লাইন করে বসে আছি। আগরতলা থেকে যারা এসেছে প্রায় সবাই ঢাকার পরিচিত মুখ, ভিতরে প্রচন্ড শব্দ এবং ভীড়ের জন্যে নড়াচড়া করা বা কথা বলার উপায় নেই। এর মধ্যেই আশেপাশের পরিচিত জনদের কাছ থেকে জানা গেল আমাদের দলের যাদের খোঁজ পাওয়া যায়নি তাদেরকে নিয়ে আসার জন্যে কয়েকবার করে আগরতলা থেকে কর্মী পাঠানো হয়েছে, কিন্তু ঢাকা এবং আগরতলাতে আমার

কোনও খোঁজ না পেয়ে সবাই আমাকে নিয়ে চিন্তিত ছিল। প্রায় সাড়ে তিন ঘন্টা বিমান চলার পর আমরা উত্তর প্রদেশের শাহরানপুর শহরে সারসোনা বিমান বন্দরে নামলাম, এটিও একটি সামরিক বিমান ঘাঁটি। রাতে আমাদের জন্যে বিমান বন্দরে তাঁবু খাটিয়ে থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে, সেখানে রাত কাটিয়ে পরদিন খুব সকালে আমরা সামরিক লরিতে করে ট্রেনিং ক্যাম্পের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করলাম।

সমতল এলাকা দিয়ে কিছুদুর আসার পর দেরাদুন শহর পার হয়ে আমাদের যাত্রা শুরু হল পাহাড়ী পথে, পাহাড় পেঁচিয়ে রাস্তা, আমরা শুধু উপরে ওঠছি আর উঠছি। চারদিকে শুধু পাহাড় আর পাহাড়, সমতলের চিহ্নও নেই, নিচের দিকে তাকালে পাহাড়ের গায়ে রাস্তার কয়েকটি স্তর চোখে পড়ে। আগেই শিলিগুড়ি থেকে যারা ট্রেনিং নিয়ে ফিরেছে তাদের কাছ থেকে আগেই যাত্রা পথের বিবরণ শুনে নিয়েছিলাম। তাই, এ সব দৃশ্য দেখার জন্যে প্রস্তুত ছিলাম। পথে কিছুক্ষণ পর পর চালকরা গাড়ি থামিয়ে চা খেয়ে শরীর চাঙ্গা করে নিচ্ছিল, আমরাও চা, নাস্তা যা পাচ্ছিলাম খেয়ে নিচ্ছিলাম। জনমানবশূন্য পাহাড়ী পথে, রাস্তার পাশের চা ঘরগুলোতে একসাথে এতগুলো লোকের চা-নাস্তার কোনও ব্যবস্থা ছিল না। তাই, আমাদেরকে ভাগে ভাগে খেয়ে নিতে হচ্ছিল। পথে কয়েক জায়গায় পাহাড়ী ঢল নেমে রাস্তা কিছুটা ধ্বসে গেছে, সে সব জায়গায় খুব সাবধানে গাড়ি পার করা হল। কিছু বিপজ্জনক যায়গায় আমাদেরকে নামিয়ে দিয়ে লরি চালকরা সাবধানে গাড়ি পার করে নিয়ে এলেন। এভাবে প্রায় ৫/৬ঘন্টার পথ পাড়ি দেওয়ার পর অবশেষে আমরা সমুদ্র-পৃষ্ঠ থেকে প্রায় ৬,৫০০ ফুট উঁচুতে মুসৌরির পাশে তান্দুয়া ট্রেনিং ক্যাম্পে[১০] গিয়ে পৌছলাম।

---

[১০]ভারতীয় মিলিটারি একাডেমির অধিনে তান্দুয়া ট্রেনিং ক্যাম্প ছাড়াও অসম রাজ্যের হাফলঙ শহরে বি.এল.এফ.'র আরও একটি ট্রেনিং ক্যাম্প চালু করা হয়। যদিও হাফলঙ সেন্টারটিতে মাত্র কয়েক ব্যাচ (কোর্স) ট্রেনিং হওয়ার পরে ক্যাম্পটি বন্ধ করে দেওয়া হয়। তান্দুয়া সেন্টারে সর্বমোট প্রায় দশ হাজার বি.এল.এফ. সদস্যকে ট্রেনিং দেওয়া হয়।

ক্যাম্পে পৌছানোর সাথে সাথে পরিচিত মুখ দেখার আশায় সবাই ছুটে এলো, সবার সঙ্গে কুশলাদি বিনিময় করে কিছু সময় কাটল। এরপর আমাদেরকে মাঠে জড়ো করে ব্রিফিং দেওয়া হলো, ভারতীয় গেরিলা ইউনিটের (এস.এফ.এফ) কর্নেল পুরকায়স্থ আমাদের স্বাগত জানালেন[১৪]। তাঁর বক্তব্যের শুরুটা ছিল নাটকীয়, লম্বা-চওড়া সাইজের কর্নেল সাহেব ব্রিফিং শুরু করার আগে ইংরেজিতে জানতে চাইলেন উনি ইংরেজিতে না হিন্দিতে বক্তৃতা দেবেন। আমরা সবাই বললাম 'ইংরেজিতে' উনি হেসে নাটকীয় ভংগিতে বললেন, "যদি বাংলায় বলি"। এরপর নিজের পরিচয় দিলেন বাংলাদেশের সিলেট অঞ্চলে উনার আদি নিবাস। যাহোক, ভারত সরকারের পক্ষ থেকে আমাদের প্রতি তাঁদের কমিটমেন্ট এবং যুদ্ধের সার্বিক পরিস্হিতি ব্যাখ্যা করে ব্রিফ করলেন।

ব্রিফিং শেষে সরবরাহকৃত যার যার জামা, কাপড়, বিছানা, বালিশ, থালা, মগ ইত্যাদি বুঝে নিয়ে আমাদের জন্য নির্ধারিত ব্যারাকে নিয়ে ওগুলো রাখলাম। পাশে দেয়াল এবং উপরে টিনের দুচালা সারি সারি অনেকগুলো ব্যারাক ছিল ওখানে, এগুলোর একেকটায় আমরা ১৫০ জন করে (এক কোম্পানি) থাকতাম। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে প্রায় ৬,৫০০ ফুট উঁচুতে ঠান্ডার জন্যে প্রথমে আমাদেরকে বরাদ্দ দেওয়া হয় ৪টি করে কম্বল, এর ৩টি আমরা নিচে বিছাতাম এবং ১টি গায়ে দিতাম, পরের দিকে যারা ট্রেনিং নিতে এসেছিল তখন শীত বেড়ে যাওয়ায় বরাদ্দ দেওয়া হয় ৮টি কম্বল, এর ৪টি নিচে বিছানায় এবং ৪টি গায়ে দিতে হতো। আমাদেরকে প্যান্ট এবং জামা

---

[১৪] বি.এল.এফ, (মুজিববাহিনী)'র ট্রেনিংএর দায়িত্ব ন্যাস্ত ছিল ভারতীয় গেরিলা ইউনিট S.F.F (Special Frontier Force)-এর হাতে এবং এই ইউনিটের দায়িত্বে ছিলেন জেনারেল এস.এস. উবান। শুরুতে বিএলএফ'র গঠন প্রক্রিয়া নিয়ে তাঁকে প্রচন্ড চাপে পড়তে হয়। কেননা, বাংলাদেশ সরকার এবং ভারতীয় ইস্টার্ন কমান্ড উভয়েই মুজিববাহিনীর স্বাধীন অস্তিত্বে (মুক্তি বাহিনী থেকে আলাদা) প্রচন্ড অসন্তোষ প্রকাশ করেন। কিন্তু বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলন ও যুদ্ধে ছাত্রদের ভূমিকা এবং গেরিলা অপারেশনের গুরুত্ব উপলব্ধি করে এই বাহিনীকে এস.এফ.এফ-এর মাধ্যমে সরাসরি ভারতীয় সেনা প্রধান জেনারেল স্যাম মানেক-শ'র অধিনে রাখা হয় (মুক্তি বাহিনী ছিল ভারতীয় ইষ্টার্ন কমান্ড এর আওতায়)। মুজিববাহিনীর প্রতি এই বিশেষ আনুকুল্যের কারণে খোদ ভারতীয় সরকারি মহলেই এই বাহিনীকে 'SAM's BOYS' বলে ডাকা হতো। ভারতীয় সামরিক একাডেমির অধীনে তান্দুয়ায় এবং অসম রাজ্যের হাফলঙে সর্বমোট প্রায় ১০,০০০ মুজিববাহিনী সদস্যদের গেরিলা যুদ্ধের ট্রেনিং দিয়ে বাঙলাদেশে পাঠানো হয়।* (তথ্য সূত্র 'PHANTOMS OF CHITTAGONG – The "Fifth Army" in Bangladesh' -Major General (Retd.) S. S. UBAN.)

একসাথে সেলাই করা এক ধরনের মোটা কাপড়ের পোষাক সরবরাহ করা হয় যার নাম ছিল 'ডাংরি'। প্রচন্ড ঠান্ডায় এবং প্রশিক্ষণের সময়ে মাটিতে গড়াগড়ি খাওয়ার জন্যে এই পোষাকটি খুবই উপযুক্ত ছিল। আমাদের মধ্যে অনেকে ট্রেনিংএর পরে জামা কাপড় বদলানোর ঝামেলা না করে এই ডাংরি পরেই কম্বলের নিচে ঢুকে পড়তো। এ ছাড়াও আমাদেরকে এক ধরনের মোটা রাবার সোলের জুতা (জঙ্গল বুট) সরবরাহ করা হয় যা পাহাড়ি পথে চলার জন্যে খুবই উপযোগী ছিল। বিছানাপত্র এবং কাপড়চোপড় গুছানোর হৈচৈ এর মধ্যে দিয়ে বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা হয়ে এলো, বিউগলের আওয়াযে সবাই আবার সমবেত হলাম এসেম্বলি মাঠে, সকলের সঙ্গে লাইনে দাঁড়িয়ে প্রাণখুলে গাইলাম 'আমার সোনার বাংলা...'।

মুজিববাহিনীর পক্ষে হাসানুল হক ইনু তান্দুয়ায় ক্যাম্প ইনচার্জ ছিলেন এখানে প্রশিক্ষক হিসেবে ভারতীয় সেনাসদস্যরা ছাড়াও ছিলেন শরীফ নূরুল আম্বিয়া, আ ফ ম মাহবুবুল হক, মাসুদ আহমেদ রুমি, নুরুল ইসলাম, পি.কে. মুখার্জী, আক্তারুজ্জামান, তৈমুর এরা সবাই ছাত্রলীগে স্বাধীনতাপন্থী ছাত্র নেতা। অনেকের কাছে প্রশিক্ষকদের সাথে নবাগতদের পরিচয় করিয়ে দেওয়া হল। তান্দুয়ায় ৩০০ জনকে নিয়ে একেকটি ব্যাচ/কোর্স গঠন করে ১ মাসের প্রোগ্রাম নির্ধারণ করে ট্রেনিং দেওয়া হয়, আমরা ৪র্থ ব্যাচে (কোর্সে) অর্ন্তভূক্ত হয়ে ট্রেনিং নেওয়া শুরু করলাম। ট্রেনিংএর সুবিধার জন্য প্রতি ব্যাচ (কোর্স) থেকে ১৫০ জন করে নিয়ে দু'টি কোম্পানি গঠন করা হতো।

প্রতিদিন সূর্য উঠার সময়ে বিউগল বাজার সাথে সাথে মাঠে গিয়ে লাইন করে জাতীয় সংগীত গেয়ে পতাকা উত্তোলন, এর পর রুমে ফিরে পিটি ড্রেস পরে রেডি হয়ে পাহাড়ি পথে লাইন করে দৌড়, বুকডন এবং পিটি। তারপর নাস্তা করে, ডাংরি এবং বুট পরে আর্মস ট্রেনিং হাল্কা, মাঝারি, ভারি প্রভৃতি অস্ত্রের সঙ্গে পরিচিত হওয়া, অস্ত্র খোলা ও লাগানো (খোলনা-জোড়না) এবং সর্বশেষে টার্গেট প্র্যাকটিস। দুপুরে খাওয়ার পর আমাদের ইনস্ট্রাক্টর ও ভারতীয় সেনাবাহিনীর গেরিলা যুদ্ধ বিশেষজ্ঞদের দ্বারা রাজনৈতিক ও গেরিলা যুদ্ধের উপর ক্লাস এবং বিকেলে (সূর্য ডুবার সময়ে) আবার জাতীয় সংগীতের সাথে পতাকা নামানো। এই ছিল আমাদের রোজকার রুটিন। মাঝে মাঝে আমাদেরকে রাইফেল, মেশিন গান ও গ্রেনেড দিয়ে টার্গেট প্র্যাকটিস করতে হতো, যদিও ঘন কুঁয়াশার মতো মেঘের কারণে প্রায়ই এই টার্গেট প্র্যাকটিসের কাজে বিঘ্ন ঘটত এবং বিলম্বিত হতো।

এছাড়া আমরা ক্যাম্পে থাকাকালীন ২-৩ বার নাইট মার্চে অংশ নিয়েছি যার অভিজ্ঞতা আমাদের জন্যে মোটেও সুখের ছিল না। ঘুটঘুটে অন্ধকার পাহাড়ি পথে নাইট মার্চের কথা শুনলেই আমরা আঁতকে উঠতাম, ভয় হতো খাঁড়া পাহাড়ি পথে একটু অসাবধান হলেই গড়িয়ে নিচে পড়ে যাব। পাহাড়ি পথে নাইট মার্চ করানো

ছাড়াও প্রায়ই আমাদেরকে ক্যাম্পের বাইরে আশেপাশের পাহাড়ে হাতেকলমে এক্সপ্লোসিভ (ডেমোলিশন) ট্রেনিং দিতে নিয়ে যাওয়া হতো। বাইরে ট্রেনিং প্রোগ্রামে সবচেয়ে সমস্যা ছিল জোঁক, জুতা পরতেও ভয় হত, কেননা, সুযোগ পেলেই জুতার মধ্যে ঢুকে রক্ত খেয়ে ঢোল হয়ে থাকত, আবার পিচ্ছিল পাহাড়ি পাথুরে রাস্তায় জুতা না পরেও উপায় ছিল না।

এখানে যারা ট্রেনিং নিতে এসেছে তারা প্রায় সবাই বিশ্ববিদ্যালয় অথবা কলেজের ছাত্র এবং রাজনৈতিক কর্মী। ভারতীয় সেনাবাহিনীর যেসব অফিসার, জুনিয়ার অফিসার এবং নন কমিশন্ড অফিসার আমাদের ট্রেনিংএর সাথে যুক্ত ছিলেন তারা সবাই অত্যন্ত আন্তরিকতা ও উৎসাহ নিয়ে আমাদেরকে শিখিয়েছেন এবং আমাদের সবাইকে সম্মান করে 'লিডার' বলে সম্বোধন করতেন। অফিসার, জেসিও (জুনিয়ার কমিশন্ড অফিসার), এনসিও (নন-কমিশন্ড অফিসার) এবং আমাদের ইনস্ট্রাক্টর সকলেই রোজ সকালে আমাদের সাথে দৌড় এবং পিটি প্যারেডে অংশ নিতেন। প্রথম দিকে আমাদের অনেকেই শারীরিক অসুস্থতার অজুহাতে পিটি-প্যারেডে যেতে চাইত না। ছাত্র জীবনের অভ্যাসের ফলে শারীরিক পরিশ্রমের চেয়েও সকালে ঘুম থেকে উঠে পিটি করতে যাওয়াটাই বিড়ম্বনার বিষয় ছিল অনেকের কাছে। একদিন আমাদের গ্রুপের বেশ ক'জন ছেলে শারীরিক অসুস্থতার অজুহাতে পিটি-প্যারেডে অনুপস্থিত রইল, বিষয়টি মেজর মালহোত্রার চোখে পড়ায় উনি সোজা ব্যারাকে গিয়ে ঢুকলেন এবং দেখলেন সেই সব ছেলেরা পিটিতে না গিয়ে শুয়ে-বসে আড্ডা দিচ্ছে। এরপর সবাইকে বাইরে এনে সকলের সামনে লাইনে দাঁড় করিয়ে কেন আমরা এখানে এসেছি, দেশের প্রতি আমাদের কর্তব্য ইত্যাদি মিলিয়ে খুব সংক্ষিপ্ত আবেগময় ভাষণ দিলেন। কিন্তু তাঁর নাতিদীর্ঘ ভাষণটুকুই আমাদের জন্যে যথেষ্ট ছিল, এরপর থেকে অল্প শরীর খারাপ থাকলেও কেউ সকালের পিটিতে অনুপস্হিত থাকত না। এমনকি অসুস্হ শরীর নিয়ে পিটি করতে গিয়ে আমাদের সঙ্গের কয়েকজন মাথা ঘুরে পড়ে গিয়েছে এবং তাদেরকে সুস্থ করে তুলতে হাসপাতাল পর্যন্ত নিতে হয়েছে।

আমাদের আবেগ অনুভূতি এদেরকেও এতটাই স্পর্শ করেছিল যে, একদিন বাইরে ট্রেনিং চলাকালে এক হাবিলদার ছুটতে ছুটতে মেজর মালহোত্রার কাছে তাঁর নামে আসা এক জরুরি টেলিগ্রাম নিয়ে এলো। টেলিগ্রামে খবর ছিল মালহোত্রার স্ত্রীর প্রসব কালিন জটিলতা দেখা দিয়েছে কাজেই খবর পাওয়া মাত্রই উনি যেন উনার দেশের বাড়িতে চলে যান। খবরটা শুনে মুহূর্তের জন্যে থমকে দাঁড়ালেন, এটাই উনাদের প্রথম সন্তান আসতে যাচ্ছে, কিন্তু সাথে সাথে নিজেকে সামলে নিয়ে হাবিলদারকে বললেন 'তুম যাকে মেরে ঘর ওয়ালোকো মেরে তরফ সে এক টেলিগ্রাম ভেজ দো, আভি হাম জং মে হায়, আউর রাজপুত জং খতম হোনেকে বাদই জিন্দা ঘর ওয়াপাস লৌটতে, নেহিত ইসকা পহেলে উনকা লাশ ওয়াপাস যাতি' (তুমি গিয়ে
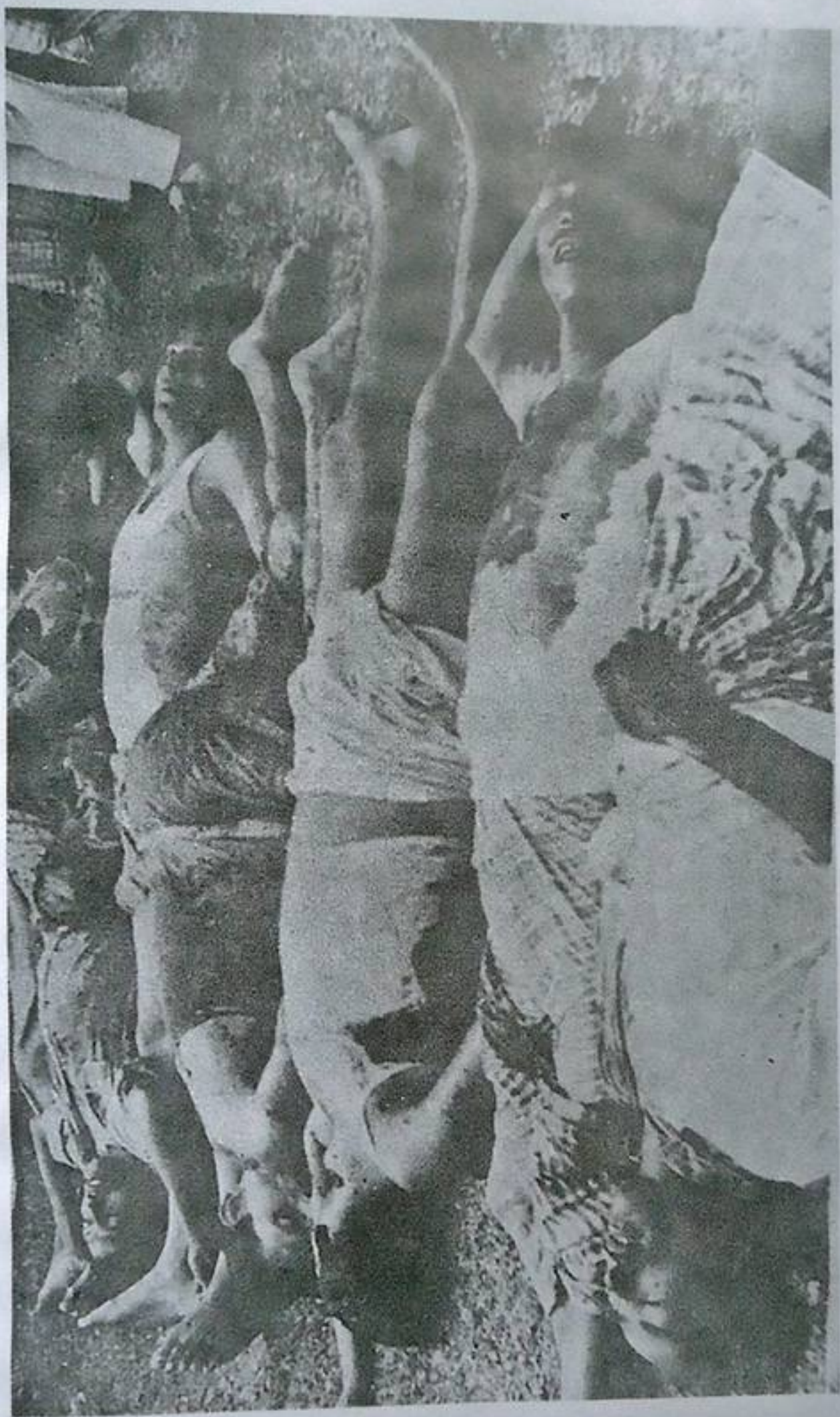
২৫ মার্চ পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর নিশৃংস হত্যাকান্ড এবং জনমনে আতংক সৃষ্টির উদ্দেশ্যে লাশের নির্মম প্রদর্শনী।
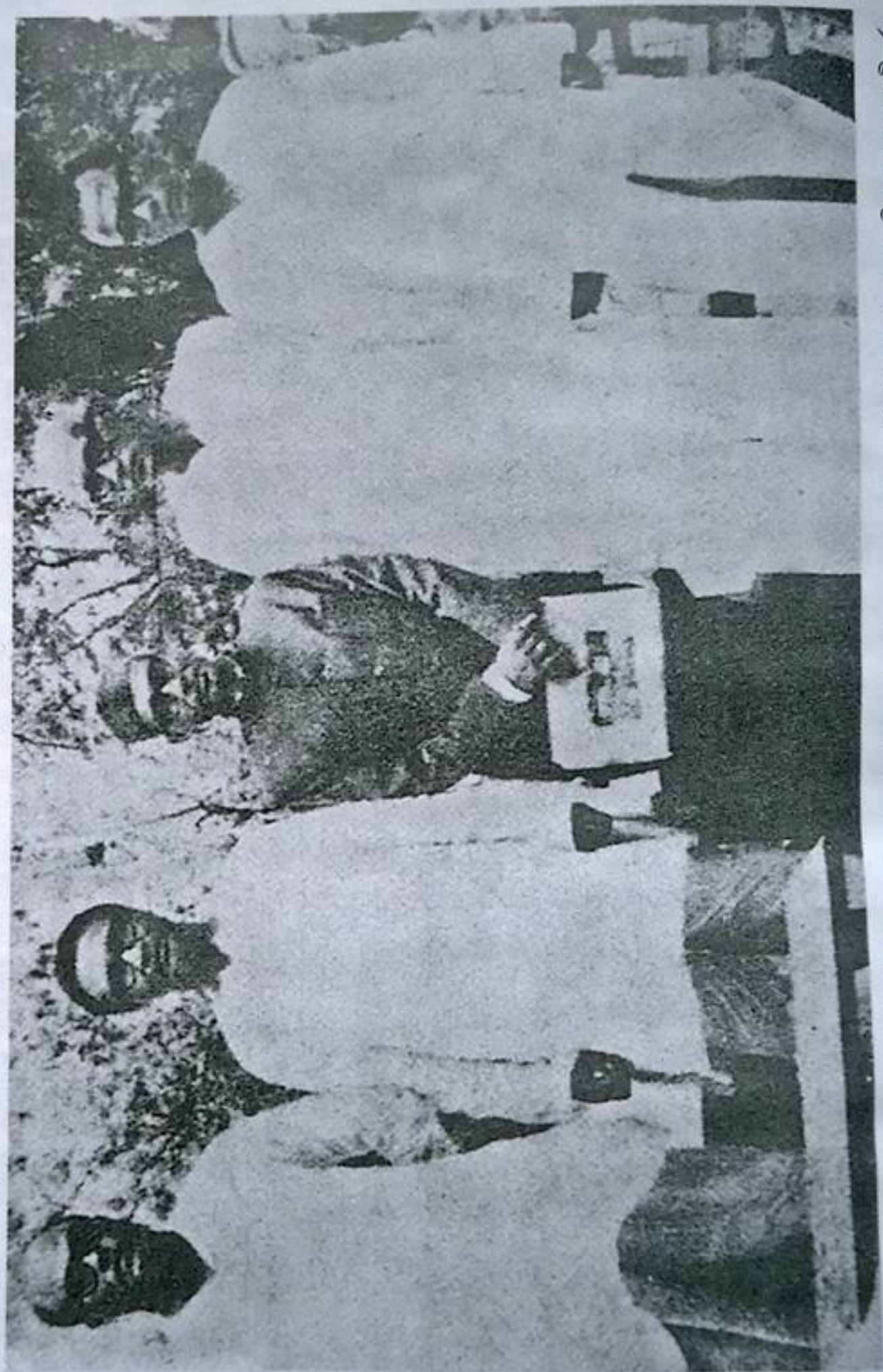
কুষ্টিয়া জেলার মেহেরপুর আম্রকাননে ১৭ই এপ্রিল ১৯৭১ বাংলাদেশ সরকার গঠিত হওয়ার পরে অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট, প্রধানমন্ত্রী ও অন্যান্য মন্ত্রীবর্গ।
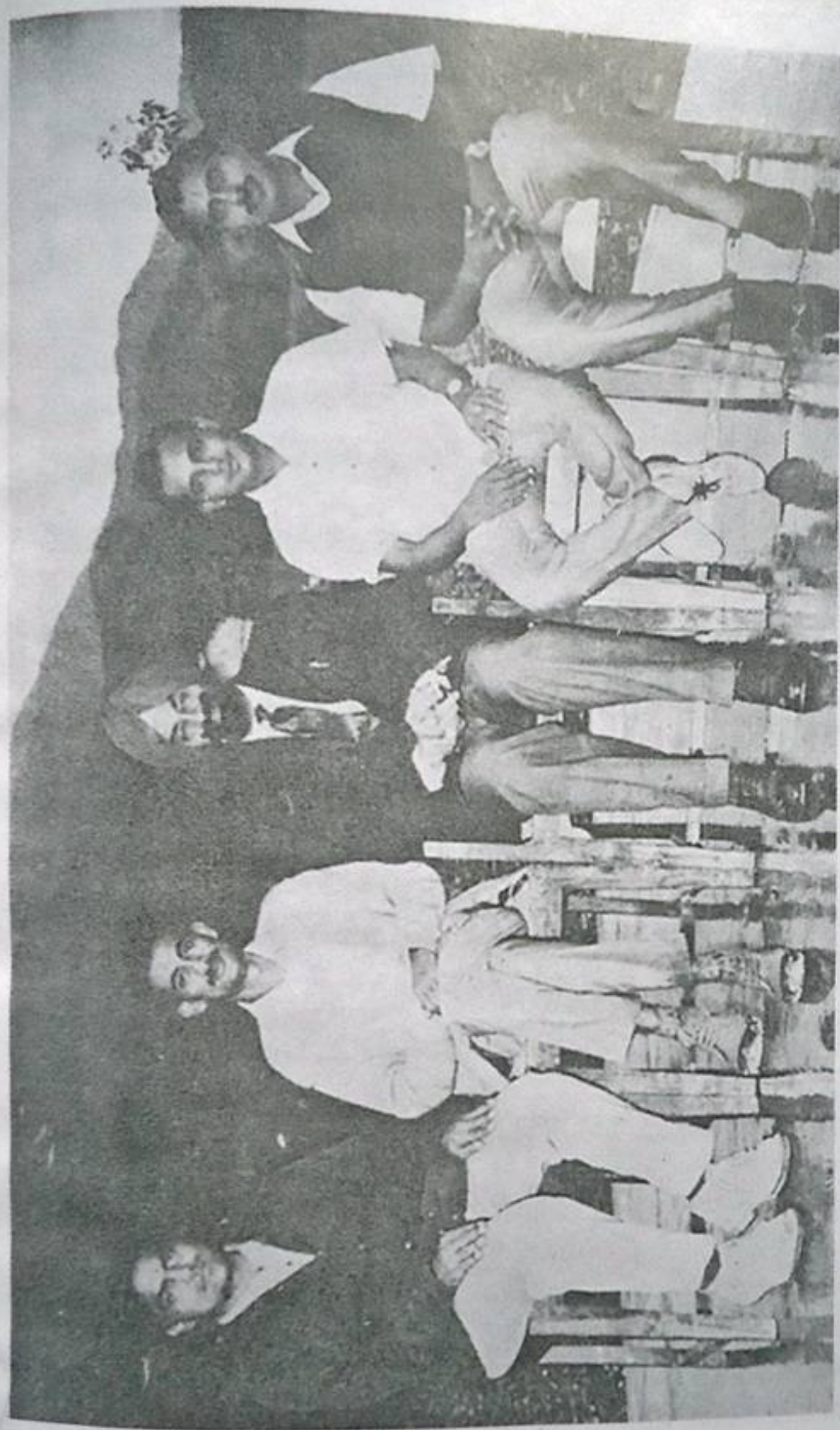
জেনারেল এস.এস. উবানের সঙ্গে বি.এল.এফ. চার অধিনায়ক।
বাম দিক থেকে সিরাজুল আলম খান, শেখ ফজলুল হক মনি, তোফায়েল আহমেদ ও আব্দুর রাজ্জাক।
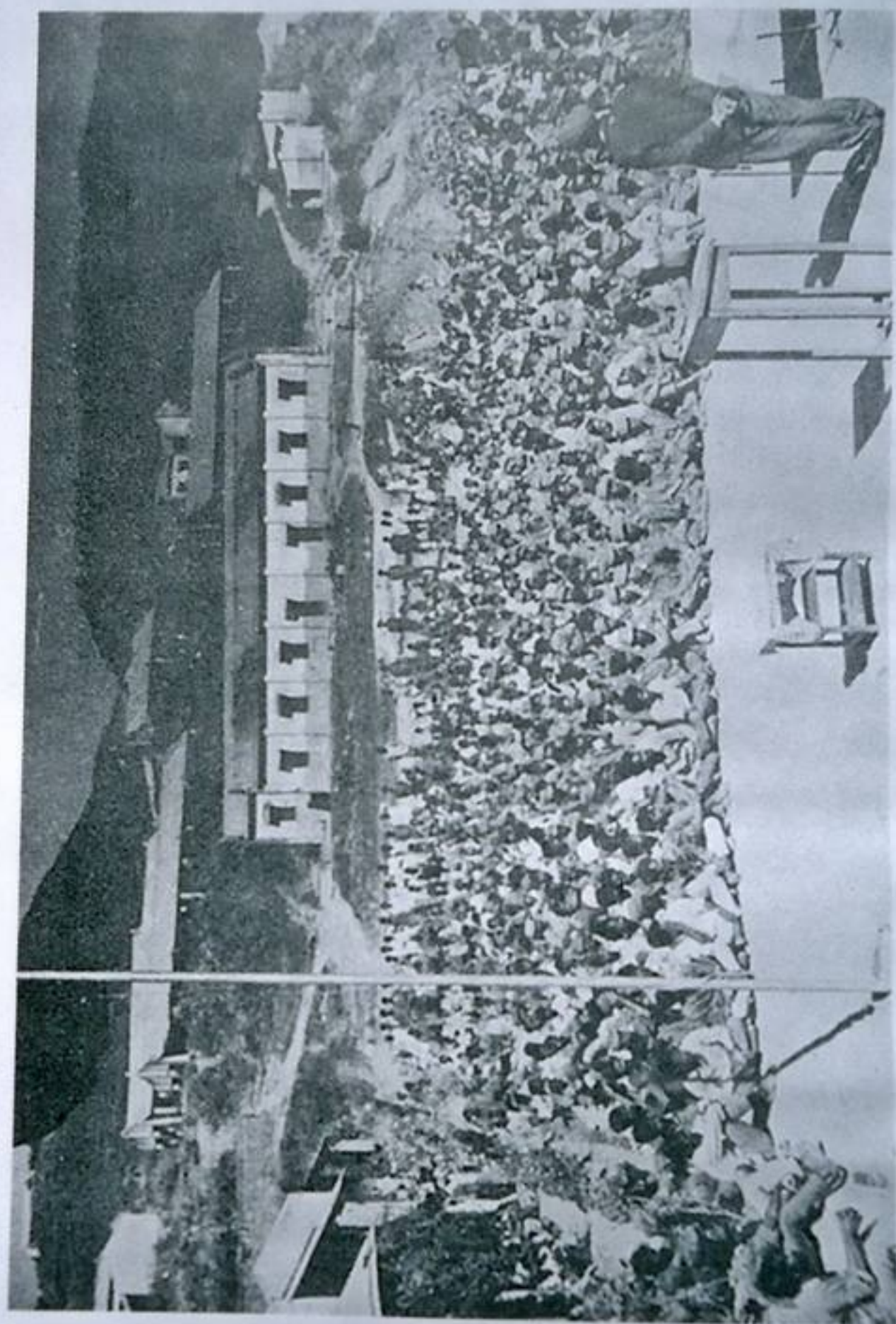
ভারতের তান্দুয়া বি.এল.এফ. প্রশিক্ষণ ক্যাম্পে প্রশিক্ষকদের উদ্দেশ্যে জেনারেল এস.এস.উবানের ব্রিফিং। পেছনে প্রশিক্ষণ শিবির।

বি.এল.এফ. আঞ্চলিক নেতৃবৃন্দের সঙ্গে জেনারেল এস.এস. উবান।

রাঙ্গামাটি অভিযানে ব্যবহৃত স্পেশাল ফোর্সের নৌযান।

১৬ ডিসেম্বর' ৭২ পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর আত্মসমর্পন এবং প্রস্থান।

১৬ ডিসেম্বর' ৭২ নগ্ন পদে বীর মুক্তিযোদ্ধাদের ঢাকা শহরে প্রবেশ।

হানাদার মুক্ত রাঙ্গামাটি শহরে জেনারেল এস.এস. উবানকে সংবর্ধনা জানান শেখ ফজলুল হক মনি (পেছনে কালো কোট পরিহিত)।

২৩ ডিসেম্বর ১৯৭২ ঢাকা বিমান বন্দরে জেনারেল উবান ও শেখ ফজলুল হক মনিকে ছাত্রলীগ নেতাদের সংবর্ধনা।

৩১ জানুয়ারী ১৯৭২ ঢাকা ষ্টেডিয়ামে বি.এল.এফ. -এর অস্ত্রসমর্পন অনুষ্ঠানে বীর যোদ্ধাদের সঙ্গে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব। পাশে দুই অধিনায়ক শেখ ফজলুল হক মনি ও আব্দুর রাজ্জাক।

৩১ জানুয়ারী ১৯৭২ ঢাকা ষ্টেডিয়ামে বি.এল.এফ. -এর অস্ত্রসমর্পন অনুষ্ঠানে আগত বীর যোদ্ধারা।

আমার পক্ষ থেকে আমার স্ত্রীকে একটি টেলিগ্রাম পাঠিয়ে দাও, এখন আমি যুদ্ধে আছি এবং রাজপুতরা যুদ্ধ শেষ হওয়ার পরেই জীবিত ঘরে ফেরত যায়। আর না হলে যুদ্ধ শেষ হওয়ার আগে শুধুমাত্র তাঁদের লাশই ঘরে ফেরত যায়)'। এরপর আর নিশ্চয় রাজপুত ঘরওয়ালির সাহস হয়নি তার সন্তানের পিতাকে দেখতে চাওয়ার তবে। আমরা ক্যাম্পে থাকাকালীন সময়েই খবর পেয়ে এসেছি যে মেজর সাহেবের স্ত্রীর স্বাভাবিক ভাবেই একটা সুন্দর ছেলে হয়েছে।

আমাদের ক্যাম্পে আর একজন হাল্কা পাতলা বয়স্ক এন.সি.ও ছিলেন। উনি শুধু ট্রেনিং এর সময়ই সঙ্গে থাকতেন না, রাতের বেলা প্রতিটি ব্যারাকে গিয়ে অভিভাবকের মতো সকলের খোঁজ খবর নিতেন। কারও শরীর খারাপ থাকলে এবং সে কারণে ট্রেনিং প্রোগ্রামে যেতে না চাইলে তার পাশে গিয়ে সাহস যুগাতেন। তাঁর সাহস যোগানোর ভাষাটা ছিল এরকম- 'ইয়ে শরীর যো হায় ইয়ে আরাম মাংগতা, যেতনি আরাম দৌগে ওতনেহি মাংগেগা' (এই শরীর সবসময়ে আরাম পেতে চায়, যত আরাম দিবে ততই আরাম চাইবে)। এখনও আমরা নিজেদের মধ্যে সেরকম কোনো প্রসঙ্গ আসলে এই উক্তিটি নিয়ে উপভোগ করি।

ভারতীয় বাহিনীর সকলেই আমাদেরকে যথেষ্ট সম্মান এবং শ্রদ্ধার চোখেই দেখতেন, তার কারণ ছিল আমাদের দেশপ্রেম এবং মনোবল। ওরা খোলাখুলি ভাবেই স্বীকার করত যে পৃথিবীর অন্যতম দুর্ধর্ষ বাহিনী, পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর সাথে আমরা লড়তে যাচ্ছ মাত্র অল্প কয়েকদিনের সামরিক প্রশিক্ষণ নিয়ে এবং সকলেই দেশে ফিরে যুদ্ধ করার জন্যে যে ভাবে উদগ্রীব এটা ওদেরকে অবাক করেছে এবং আমাদের প্রতি ওদের সম্মান বাড়িয়ে দিয়েছে (ওদের অনেকেরই ধারণা ছিল ভারতের নিরাপদ আশ্রয়ে থেকে আমরা সহজে দেশে ফিরতে চাইব না)।

আমাদের ক্যাম্পের চারিদিকে শুধু পাহাড় আর পাহাড়, উপরে নিচে ডাইনে বায়ে সবদিকে শুধু পাথরে ঢাকা গাছপালা বিহীন ধূসর বর্ণের সব মন খারাপ করা পাহাড়। কুঁয়াশা না থাকলে নিচে তাকিয়ে রূপালি ফিতার মতো একটি ঝর্ণা দেখা যেত আর দিন-রাত পাহাড়ে পাহাড়ে ধাক্কা খেয়ে ভেসে আসত তার পথ চলার গুরুগম্ভীর আওয়াজ। প্রথম দিন ময়লা কাপড়চোপড় ধুয়ে বারান্দায় ঝুলিয়ে ট্রেনিংয়ে গেলাম, ফিরে এসে হতবাক, নিংড়ানো কাপড় শুকানো দুরে থাক ভিজে একেবারে চপচপে হয়ে আছে। ক্যাম্পের পুরনো ছেলেরা হেসে একাকার, তখন জানলাম কুঁয়াশার মতো দেখতে এগুলো আসলে মেঘ, ওরা বুদ্ধি দিল কাপড় শুকাতে চাইলে কম্বলের নিচে রেখে শরীরের গরমে শুকাতে হবে। যদিও ঠান্ডা ভিজে আবহাওয়ার কারনে গা- হাত, পা ধোয়া এবং গোছলেরও খুব একটা প্রয়োজন হতোনা।

সমতল ভূমির লোক আমরা, উপরের দিকে তাকিয়েই মেঘ দেখতে অভ্যস্ত কিন্ত এখানে এসে ৬,৫০০ফুট উঁচু থেকে মেঘ ছুঁয়ে দেখার অভিজ্ঞতা হল আবার নিচের

দিকে তাকিয়ে দেখতাম কীভাবে পাহাড়কে জড়িয়ে জড়িয়ে মেঘ ভেসে যায়। সবচেয়ে অবাক লাগত যখন রংধনু দেখতাম নিচের দিকে তাকিয়ে। ট্রেনিংয়ের ব্যস্ততায় সময় ভালোই কাটত। অবসর হলেই দেশের জন্যে খুব খারাপ লাগত, মনে হত এত দূরের এই অজানা- অচেনা পরিবেশ থেকে আর কি দেশে ফিরতে পারব? আমাদের ক্যাম্পের তিব্বতীরাও আমাদের জন্যে একটি হতাশার কারণ ছিল, মনে হতো ওদের মতোই আমাদেরও হয়তো আর কোনদিন দেশে ফেরা হবে না।

আমাদের সঙ্গে রাজশাহী, বগুড়া, রংপুরের কিছু ছেলে ছিল, রাতে ওরা ভাওয়াইয়া এবং পল্লী গীতি গাইত, নীরব নিস্তব্ধ পরিবেশে মন উদাস করা গান শুনতে শুনতে কখন যে ঘুমিয়ে পড়তাম টেরই পেতাম না। ছুটির দিনগুলোতে (রোববার) গোছল ও কাপড়চোপড় ধুয়ে এবং ব্যারাকে ব্যারাকে ঘুরে সবার সঙ্গে দেশের গল্প এবং রাজনৈতিক আলাপ-আলোচনা করেই সময় কাটত। এছাড়া ছুটির দিনে দল বেঁধে ক্যান্টিনে গিয়ে দুর্গার কফি খাওয়াটা আমাদের জন্যে একটা আয়েশী ব্যাপার ছিল। মাঝে মঝে আমরা এই ক্যান্টিন থেকে বিস্কুট এবং টিনের মাছ কিনে এক্সপ্লোসিভ পাউডার জ্বালিয়ে সেই আগুনে মাছ গরম করে খেতাম।

এ ভাবে দিন, সপ্তাহ, মাস গিয়ে অবশেষে আমাদের দেশে ফেরার সময় হলো। সব রকম অস্ত্রের ট্রেনিং নেয়ার পর বিপ্লবী চে গুয়েভারার সেই কথাকেই মনের মধ্যে গেঁথে নিলাম 'IT IS NOT THE WEAPON THAT FIGHTS, IT IS THE MAN BEHIND THE WEAPON AND THE IDEOLOGY BEHIND THE MAN THAT FIGHTS' (অস্ত্র যুদ্ধ করে না। অস্ত্রালক মানুষ এবং তার আদর্শই যুদ্ধ করে।)

সবাইকে ছেড়ে যেতে খারাপ লাগছিল। পরের ব্যাচে গোপালগঞ্জের বেশ কিছু ছেলে এসেছে, বড় পাওনা হিসেবে ওদের সাথে ঘনিষ্ঠ হওয়ার সুযোগ পাওয়া গেছে। এছাড়া আমার ঢাকার বেশ কিছু ঘনিষ্ট রাজনৈতিক বন্ধু এবং সহকর্মিও ছিল কিন্ত ওরা এখান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে চলে যাবে আগরতলায়। যাওয়ার দিন যদিও ক্যাম্পে আমাদের বিদায় উপলক্ষে ভুরি ভোজের আয়োজন ছিল, কিন্তু এক বাঙালি ভারতীয় সেনা সদস্যের বুদ্ধিতে(যেহেতু খাওয়ার পর পরই দুপুরে আমাদের গাড়ি ছাড়বে) প্রায় কিছুই খেলাম না। পরে তাকে মনে মনে অজস্র ধন্যবাদ জানিয়েছি, কেননা যারাই খাওয়া দাওয়া করেছে তারা প্রত্যেকে ফেরত জার্নিতে খুব কষ্ট পেয়েছে, পাহাড়ি পথে ঘুরে ঘুরে নামার সময় মাথা ঘুরে গাড়ির মধ্যে বমি করে সবাই একাকার করেছে। পাহাড় ছেড়ে গড়িয়ে গড়িয়ে একসময় গাড়ি সমতলে নেমে এলো, আমরাও অনেকদিন পর মানুষজন, ঘরবাড়ি আর চারিদিকে পরিচিত পরিবেশ দু'চোখ ভরে উপভোগ করলাম।

আসার পথে আমাদেরকে আবার সামরিক পরিবহণ বিমানে করে সরাসরি কলকাতায় দমদম বিমান বন্দরে নিয়ে আসা হল, বিমান বন্দরের পাশেই ব্যারাকপুর ক্যান্টনমেন্ট এলাকাতে আলাদা বাড়ি ভাড়া করে মুজিববাহিনীর পশ্চিমাঞ্চলের 'ইনডাকসন ও ট্রানজিট ক্যাম্প' করা হয়েছে। তোফায়েল ভাইয়ের অধীনে পরিচালিত এই ক্যাম্পের প্রশাসনিক দায়িত্বে ছিলেন কাজী আরেফ আহমেদ এবং ইনডাকসনের দায়িত্বে ছিলেন নূর আলম জিকু। এখানে এসে শুরু হল অপেক্ষা করার পালা, কেননা, 'কোরিয়ার'[১৫] ঠিক হবে, পথের শেল্টার ঠিক করা হবে, এরপর আমরা রওয়ানা হব। আমরা এখানে আসার আগে কবিরুল ইসলাম মাও, শাহ মো. আবু জাফরসহ ফরিদপুর অঞ্চলের একটি বড় গ্রুপকে (প্রায় ১১০জনের) অত্যাধুনিক অস্ত্র দিয়ে দেশে পাঠানো হয়েছিল কিন্তু কোরিয়ারের বিশ্বাসঘাতকতার কারণে তারা সবাই পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীর হাতে ধরা পড়ে। অপেক্ষার মধ্যে আবার আমাদের পরের ব্যাচের ইসমত কাদির গামাসহ গোপালগঞ্জের ছেলেরা ট্রেনিং শেষে কলকাতায় এসে পড়ল। তোফায়েল ভাই মাঝে মাঝে এসে আমাদেরকে দেখে যান, এরমধ্যে একবার শেখ ফজলুল হক মনি এবং সিরাজুল আলম খানও এলেন আমাদের ক্যাম্পে। আলাপ আলোচনার এক ফাঁকে সিরাজ ভাই আমার সঙ্গে কিছুক্ষণ আলাপ করলেন এবং আমার গোপালগঞ্জ যাওয়ার সিদ্ধান্ত পুন:বিবেচনা করতে বললেন। কিন্তু আমি ভারতে আসার আগে, গোপালগঞ্জে কিছুদিন কাজ করে এবং ট্রেনিং ক্যাম্পে গোপালগঞ্জের ছেলেদের সাথে আলাপ করে খুবই আত্মবিশ্বাসী ছিলাম। সুতরাং উনার সাবধান বাণীর গুরুত্ব না দিয়ে জানালাম আমি গোপালগঞ্জেই যাব।

কয়েকদিন পরে আমাদের দেশে যাওয়ার দিনক্ষণ ঠিক হল। আমাদের আর্মস, গোলা-বারুদ সব সামরিক ট্রাকে তুলে দেওয়া হল। এবার এক এক করে বিদায় নিয়ে আমাদের ট্রাকে উঠার পালা, ট্রাক আমাদেরকে বর্ডার পর্যন্ত ছেড়ে দিয়ে আসবে। যশোর অঞ্চলের ইনডাকসন লিডার রফিকুল ইসলাম এসেছে। আমাদেরকে বিদায় জানাতে, উনার সাথে কোলাকুলি করতে গিয়ে আমার হাত গিয়ে পড়ল উনার প্যান্টের পকেটে রাখা রিভলভারের উপর। তাড়াতাড়ি রিভলভারটা ঠেলে পকেটে ঢুকাতে গিয়ে চাপ লেগে ফায়ার হয়ে গেল। গুলি রফিকুল ইসলামের পকেট ফুটো করে আমার ডান উরুর এক পাশ দিয়ে ঢুকে আরেকপাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল। কিছু বুঝার আগেই আমি

---

[১৫] ট্রেনিং শেষে মুজিববাহিনীর সদস্যদেরকে গ্রুপ করে যার যার এলাকায় প্রবেশ করানোর জন্যে, কিছুটা রাজনৈতিক পরিচয়ে, দেশের মধ্যে থেকে কোরিয়ার নিযুক্ত করা হতো। এরা পথ-ঘাট সম্পর্কে ওয়াকিবহাল থাকতো এবং পাকিস্তানি মিলিটারি ও তাঁদের দালালদের দৃষ্টি এড়িয়ে টিমগুলোকে তাদের গন্তব্যস্থানে পৌছে দিত।

ঘুরে মাটিতে পড়ে গেলাম এবং আমার প্যান্টের ফুটো দিয়ে রক্ত বের হতে লাগল। আমাকে দমদম ক্যান্টনমেন্ট হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হল। কপাল ভালো আঘাত মোটেও গুরুতর নয়, গুলি শুধুমাত্র উরুর মাংস এফোঁড় ওফোঁড় করে বেরিয়ে গেছে। তোফায়েল ভাই ইনডাকসন উপলক্ষে সকলকে বিদায় জানাতে তখন উপস্থিত ছিলেন, সবাই দেখতে এলো, হৈচৈ এর মধ্যে কিছুটা দেরি হলেও আমার দ্রুত সুস্থতা কামনা করে সবাই আমাকে রেখেই বিদায় নিলো।

অসহায় ভাবে মন খারাপ করে কিছুদিন হাসপাতালের বিছানায় পড়ে রইলাম, রফিকুল ইসলাম প্রায় রোজই একবার করে দেখতে আসেন, আমার অবস্থার জন্যে তাঁর নিজের কাছে খারাপ লাগে বলে। সুস্থ হওয়ার পর প্রধান সমস্যা হয়ে দাঁড়াল দেশে ফেরা, আমাদের এলাকার অর্থাৎ গোপালগঞ্জ, ফরিদপুর, বরিশাল এলাকার কোনো গ্রুপ আর দেশে ঢুকার বাকী নেই, ট্রেনিং সেন্টারেও নেই, তাই কবে দেশে ফিরতে পারব সেটাই এখন অনিশ্চিত। তোফায়েল ভাইয়ের কাছ থেকে জানতে পারলাম তান্দুয়া ট্রেনিং ক্যাম্প গুটিয়ে আনা হচ্ছে, আমাদের বেশিরভাগ ট্রেনিং ইনস্ট্রাক্টরদেরকে যার যার কমান্ড এলাকার ক্যাম্পে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। এখন দেশে ঢুকে সর্বাত্মক যুদ্ধের কাজ। গেরিলা যুদ্ধের নিয়মে পরবর্তি রিক্রুটমেন্ট, ট্রেনিং, যুদ্ধ-পরিচালনা ইত্যাদি সবই হবে দেশের ভিতরে। দেশের মধ্যে একটি এলাকা স্বাধীন করে দীর্ঘ মেয়াদি গেরিলা যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুতি নিতে সব দিক বিবেচনায় এনে পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকাটিকে উপযুক্ত বলে বিবেচনা করা হয় এবং সে কারণেই আগরতলা ক্যাম্পে দেশে ঢোকার জন্য অপেক্ষমান ৭ম ও ৮ম ব্যাচে ট্রেনিং প্রাপ্ত মুজিববাহিনীর সদস্যদেরকে ভারতীয় এস.এফ.এফ. সদস্যসহ পার্বত্য চট্টগ্রাম দখলের অভিযানে পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

পার্বত্য চট্টগ্রাম অভিযান

বি.এল.এফ-এর পার্বত্য চট্টগ্রাম অভিযান এবং এইবাহিনী গঠন নিয়ে কিছু কথা বলা প্রয়োজন। ১৯৬৬সালে শেখ মুজিবর রহমান ৬-দফা ঘোষণা করার পর তাঁর দল আওয়ামী লীগের একটি অংশ আব্দুস সালামের নেতৃত্বে আলাদা হয়ে যায় এছাড়াও দলের মধ্যে অনেকেই নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়েন। এসময়ে আওয়ামী লীগের ১৫নং পুরানা পল্টন একচালা অফিসে হাতে গোনা গুটিকয়েক নেতা-কর্মী ছাড়া কাউকেও বিশেষ একটা দেখা যেত না। অবস্থা এমন দাড়ায় যে ছাত্রলীগের ছেলেরাই আওয়ামী লীগের কর্মসূচীতে মাইকিং, পোস্টার লেখা ও লাগানোসহ দলিয় প্রেসরিলিজগুলো পর্যন্ত পত্রিকা অফিসগুলোতে পৌঁছে দিয়ে আসত। ১৯৬৯এ ছাত্রদের নেতৃত্বে গণ-আন্দোলন সাফল্য লাভ করায় এবং বঙ্গবন্ধু কারাগার থেকে বের হয়ে এলে অবস্থার পরিবর্তন ঘটে, ৫১/এ নম্বর পুরানা পল্টনে একটি সম্পূর্ন দোতালা বাড়ি আওয়ামী লীগের কেন্দ্রিয় অফিসের জন্যে ভাড়া নেওয়া হয়। ১৯৭০-এর নির্বাচনে আওয়ামী লীগ একক দল হিসেবে জয় লাভ করায় ক্ষমতার সুখস্বপ্নে অনেকেই বিভোর হয়ে পড়েন। কিন্তু নির্বাচন পরবর্তীতে বঙ্গবন্ধুর আপোষহীন কঠোর মনোভাব এদেরকে হতাশ করে এবং বঙ্গবন্ধুর এই কঠোর মনোভাবের জন্য তাঁরা ছাত্রনেতাদেরকে দায়ী করে খোলাখুলি মন্তব্য ও ক্ষোভ প্রকাশ করেন। ২৫শে মার্চ মিলিটারি ক্রাকডাউনের পর আওয়ামী লীগের সকল স্তরের নেতা-কর্মীদের প্রতি পাকিস্তানি সামরিক জান্তার অনমনীয় মনোভাব প্রত্যক্ষ্য করে এদের অনেকে ভারতে যেতে বাধ্য হন। অনেক নেতাদেরকে আবার কয়েক দফায় ভারতের ক্যাম্প থেকে ছাত্রদের পাঠিয়ে খুঁজে নিয়ে যেতে হয়। বঙ্গবন্ধুর অবর্তমানে ছাত্রনেতৃবৃন্দ এই সকল নেতাদের কর্মকান্ড সবসময়েই বিচলিত ছিলেন যার ফলে স্বাধীনতা সংগ্রামের সময়ে বঙ্গবন্ধু ফিরে না আসা পর্যন্ত ছাত্রনেতৃবৃন্দ প্রবাসি সরকারে যোগ দিতে অস্বীকার করেন এবং চার ছাত্রনেতা (শেখ ফজলুল হক মনি, সিরাজুল আলম খান, আব্দুর রাজ্জাক, তোফায়েল আহমেদ) ছাত্রলীগের নেতৃত্বে আলাদা বাহিনী গড়ে তুলতে সচেষ্ট হন। ভারত সরকার শুরুতেই ছাত্রনেতৃবৃন্দের দাবীর যথার্থতা এবং গুরুত্ব উপলব্ধি করে ছাত্রদেরকে আলাদা ট্রেনিং সুবিধা প্রদান করতে সম্মত হন। বাংলাদেশ সরকার বি.এল.এফ.'র (মুজিববাহিনী)এর স্বতন্ত্র অস্তি ত্বের প্রশ্নে প্রথমেই আপত্তি তোলে, ভারতীয় ইস্টার্ন কমান্ড মুক্তিবাহিনীর মতো বি.এল.এফ.কেও তাদের অধীনে ন্যস্ত করার দাবী জানায়। ভারতীয় ইস্টার্ন জোনের কমান্ডার লে. জেনারেল অরোরা এবং বি.এল.এফ.'র দায়িত্বপ্রাপ্ত মেজর জেনারেল এস.এস. উবান বি.এল.এফ. এফ.এফ.'র মধ্যে সমন্বয় ও দায়িত্ব বন্টনের প্রশ্নে আলোচনায় বসে উভয়ে সম্মত হন যে, সীমান্ত এলাকার ২০ মাইলের মধ্যে অভিযানের দায়িত্ব থাকবে মুক্তিবাহিনীর এবং এই সীমারেখার পরে, দেশের ভিতরে অভিযান পরিচালনার দায়িত্ব থাকবে মুজিব বাহিনীর। এই এলাকা বন্টনে সম্মত

হলেও ছাত্রনেতৃবৃন্দ লে. জে. অরোরার অর্থাৎ ভারতীয় ইস্টার্ন কমান্ডের অধীনে তাঁদের দায়িত্ব পালন করতে অস্বীকার করেন। এছাড়া ভারতীয় কর্তৃপক্ষকে দেশের ভিতরে বি.এল.এফ.'র গোপন ঘাঁটিগুলোর ঠিকানা জানাতেও তাঁরা অস্বীকার করেন। পরে ঠিক করা হয় যে মুজিববাহিনীর সদস্যদেরকে দেশে ঢোকানোর সময়ে তাঁরা শুধুমাত্র স্থানীয় মিলিটারি কমান্ডকে অবহিত করে দেশে ঢুকাবে এবং এই অবহিত করার কাজে (ভারতীয় মিলিটারির সাথে লিঁয়াজো স্থাপনের উদ্দেশ্যে) সীমান্ত এলাকা জুড়ে এস.এফ.এফ.'র লে. কর্নেলকে দায়িত্ব দেওয়া হয়।

বাঙলাদেশের স্বাধীনতা এবং শেখ মুজিবর রহমানের মুক্তি এই দুইটি বিষয়ে দীর্ঘমেয়াদি যুদ্ধের প্রস্তুতি নিয়ে মুজিববাহিনীকে সম্পূর্ণভাবে অপ্রচলিত যুদ্ধের (গেরিলা যুদ্ধ) প্রশিক্ষণ দিয়ে গড়ে তোলা হয়। এই বাহিনীর সকলেই ছিলেন একটি মাত্র ছাত্র সংগঠনের (ছাত্রলীগের) পরীক্ষিত, ত্যাগি এবং আদর্শ কর্মী অপরদিকে সমাজের বিভিন্ন স্তরের লোক নিয়ে একটি নিয়মিত বাহিনীর ধাঁচে মুক্তিবাহিনীকে গড়ে তোলা হয়। ছাত্রনেতৃবৃন্দ প্রথমেই ঠিক করে নেন প্রতি এলাকা থেকে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক কর্মী প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হওয়ার পরে মুজিববাহিনীর মূল ঘাঁটি দেশের মধ্যে স্থানান্তর করা হবে এবং পরবর্তীতে গেরিলাযুদ্ধের নিয়মে এই বাহিনীর রিক্রুটমেন্ট, ট্রেনিং ও অভিযান সবই দেশের ভেতর থেকেই পরিচালনা করা হবে। যেহেতু দেশে ফিরে গিয়ে এরাই মুজিববাহিনীর জন্যে নতুন সদস্য রিক্রুট করবে এবং এদেরই নেতৃত্বে সেইসব নতুন সদস্যদের গেরিলা যুদ্ধের প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে সে কারণে ভারতে ট্রেনিংপ্রাপ্ত বি.এল.এফ.-এর সকল সদস্যকে 'লীডার' বলে ডাকা হতো। '৭১-এর সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে প্রায় ১০ হাজার বি.এল.এফ. সদস্য ট্রেনিংপ্রাপ্ত হওয়ার পরে নেতৃবৃন্দ ভারতে তাঁদের কার্যক্রম গুটিয়ে ফেলে দেশের আভ্যন্তরে মূল ঘাঁটি স্থানান্তরের সিদ্ধান্ত নেন এবং সেই লক্ষ্যে প্রথমেই পার্বত্য চট্টগ্রামকে মুক্ত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

মেজর জেনারেল (অব:) এস এস উবানের লেখা 'PHANTOMS OF CHITTAGONG-The 'Fifth Army' in Bangladesh' বইয়ের বর্ণনা মতে প্রধানত ৩টি কারণে প্রথমেই পার্বত্য চট্টগ্রামকে মুক্ত করার জন্য বেছে নেওয়া হয়। (১) পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূ-প্রকৃতি গেরিলা ঘাঁটির জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত (২) দেশের একমাত্র সমুদ্র বন্দর হিসেবে চট্টগ্রামকে আলাদা করে ফেলতে পারলে পাকিস্তানিদের সরবরাহ লাইন দুর্বল হয়ে যাবে এবং (৩) পাকিস্তানিদের এই পথ হয়ে আরাকান দিয়ে পালানোর পথ বন্ধ করে দিতে পরলে তাদের মনোবল ভেঙ্গে পড়বে।

সেপ্টেম্বর মাসে মুজিববাহিনীর পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ডার শেখ ফজলুল হক মনি আগরতলা ক্যাম্পে প্রশিক্ষণ শেষে দেশে ঢোকার জন্যে অপেক্ষমাণ মুজিববাহিনীর সদস্যদেরকে পার্বত্য চট্টগ্রাম অভিযান সম্পর্কে অবহিত করেন এবং তাদেরকে প্রস্তুত

হতে বলেন। ভারতীয় এস.এফ.এফ.[১৬] -এর সঙ্গে হাফলং এবং তান্দুয়ায় ট্রেনিংপ্রাপ্ত প্রায় ২০০জন সদস্য এবং আরও ১৫০ জনের মত স্থানীয় প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত বি.এল.এফ. সদস্যদেরকে নিয়ে এই অভিযানের প্রস্তুতি নেওয়া হয়। ভারতের মিজোরাম রাজ্যের দেমাগিরি নামক স্থানে এস.এফ.এফ. ও মুজিববাহিনীর এই যৌথ অভিযানের হেড কোয়ার্টার স্থাপন করা হয়। ভারতীয় এস.এফ.এফ. বাহিনীর প্রধান জেনারেল এস.এস. উবান এই মিশনের কমান্ডে ছিলেন, এর পর ছিলেন ভারতীয় বাহিনীর কর্নেল পুরকায়স্থ, মেজর মালহোত্রা প্রমুখ। মুজিববাহিনীর পক্ষে এই বিশেষ অভিযানের কমান্ডে ছিলেন পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ডার শেখ ফজলুল হক মনি, অভিযানে সহকারি কমান্ডার ছিলেন মুন্সিগঞ্জের জনাব আব্দুর রব। এছাড়াও অভিযানে অংশগ্রহণকারী ট্রেনিংপ্রাপ্ত উল্লেখযোগ্য ছাত্রলীগ নেতাদের মধ্যে ছিলেন কেন্দ্রিয় নেতা মনিরুল হক চৌধুরী, বাবু স্বপন কুমার চৌধুরী[১৭], সাইফুল গনি চৌধুরী, চট্টগ্রামের ছাত্রলীগ নেতা মহিউদ্দিন চৌধুরী (বর্তমান সিটি মেয়র), ঢাকা মহানগর ছাত্রলীগের তৎকালিন সহ-সভাপতি শেখ আতাউর রহমান, ঢাকা মহানগর ছাত্রলীগ নেতা ফজলুর রহমান ভুলু, কাজী জাহাঙ্গীর আমীর, শাহাদাত হোসেন, আকরামুজ্জামান, মাইনুদ্দিন মিজান, ঢাকা মহানগর আওয়ামী লীগ কর্মী হাশিম উদ্দিন হায়দার পাহাড়ী, সাচ্চু, বাবলু প্রমুখ। কুমিল্লার ছাত্রলীগ নেতা নাজমুল হাসান পাখী ও চাঁদপুরের ('৭১সনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত) শফিউল্লাহ প্রমুখ। মূলত ঢাকা, চট্টগ্রাম, নোয়াখালী ও কুমিল্লা জেলার মুজিববাহিনীর যোদ্ধারাই ছিল এই বিশেষ অভিযান দলের সদস্য।

অক্টোবর মাসে বি.এল.এফ-এ'র সদস্যগণ পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রবেশ করে এবং রাঙ্গামাটি মহকুমার আমতলা রাঙ্গা পাহাড় নামক স্থানে এই বিশেষ অভিযানের সদর দফতর স্থাপন করা হয়। এ ছাড়া তিন ভাগে বিভক্ত হয়ে তিন যায়গায় তিনটি মুক্তাঞ্চল ঘোষণা করা হয়, এ গুলো ছিল যথাক্রমে মারিস্যা, হরিণা ও বরকল। দোহাজারী এলাকার আরাকান সড়কে সাংগু নদীর ব্রীজ ধংস করে দিয়ে এই বাহিনী

---

[১৬] ভারতীয় এস.এফ.এফ. (স্পেশিয়াল ফ্রন্টিয়ার ফোর্স) একটি উচ্চ প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত গেরিলা দল যেটি ১৯৬২সনে চীনের তিব্বত দখলের পর উত্তরের পাহাড়ী উপজাতীয়দের নিয়ে জেনারেল এস.এস. উবানের অধীনে গড়ে তোলা হয়।

[১৭] ছাত্রলীগ কেন্দ্রিয় সংসদের সহ-সভাপতি বাবু স্বপন কুমার চৌধুরী মুজিববাহিনীর অন্যতম সংগঠক ছিলেন। পার্বত্য চট্টগ্রাম অভিযানে শেখ ফজলুল হক মনির নির্দেশ নিয়ে মূল দলের সঙ্গে যোগ দিতে গিয়ে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর হাতে ধরা পড়েন। হাসপাতাল থেকে পাওয়া খবর অনুযায়ি তাঁর হাত ও পায়ের আঙ্গুলগুলো একএক করে কেটে ফেলা হয়। নির্মম অত্যাচারের পর তাঁকে রাঙ্গামাটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। পরবর্তিতে নভেম্বর মাসের মাঝামাঝি, পাকিস্তানি বাহিনী পিছু হটার সময়ে, তাঁকে হাসপাতাল থেকে নিয়ে যায়, স্বাধীনতার পরে অনেক খোঁজাখুঁজি করেও তাঁর কোনও খবর পাওয়া যায়নি।

পাকিস্তানিদের সড়কপথে আরাকান হয়ে পালানোর রাস্তা বন্ধ করে দেয়। যার ফলে তাদের মনোবল ভীষণভাবে ভেঙে পড়ে।

এই বিশেষ বাহিনী পার্বত্য নভেম্বর মাসের শেষে চট্টগ্রামের জেলা শহর রাঙ্গামাটি মুক্ত করে এবং রাঙ্গামাটিতে শেখ ফজলুল হক মনি জেনারেল উবানকে সংবর্ধনা প্রদান করেন। ডিসেম্বরে পাক বাহিনীর আত্মসমর্পণের পর এই বিশেষ অভিযানকারি দল বিজয়ীর বেশে চট্টগ্রামে প্রবেশ করে এবং শহরে কয়েকদিন অবস্থানের পর মুজিববাহিনীর সদস্যরা যার যার নিজের এলাকায় ফিরে গিয়ে তাদের মূল বাহিনীর সঙ্গে যোগ দেন।

ইনটেলিজেন্স ট্রেনিং

ব্যারাকপুর ক্যাম্পে দেশে ফেরার অপেক্ষা করার সময়ে ভারতীয় কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে আমাদের নিজেদের বিভিন্ন এলাকার গ্রুপগুলোর মধ্যে সমন্বয় সাধন করা এবং ইনটেলিজেন্স নেটওয়ার্ক গড়ে তোলার জন্যে, প্রতি জেলা থেকে অন্তত একজন বি.এল.এফ. সদস্যকে প্রশিক্ষণ দেওয়ার প্রস্তাব করা হলে, আমাকে এই প্রশিক্ষণ প্রোগ্রামের মধ্যে আন্তর্জাতিকরা হয়। ভারতীয় কেন্দ্রীয় ইনটেলিজেন্সের সরাসরি তত্ত্বাবধানে এই ট্রেনিং প্রোগ্রাম শুরু হয়। নিজেদের ইউনিটগুলোর মধ্যে যোগাযোগের গুরুত্ব এবং যোগাযোগ স্হাপনের কৌশল, শত্রুপক্ষের মুভমেন্ট সামরিক শক্তি বুঝার কৌশল এবং ইত্যাদি বিষয়ে এবং বিশেষ করে ইনটেলিজেন্স নেটওয়ার্ক গড়ে তোলার উপর গুরুত্ব এবং গড়ে তোলার পদ্ধতি শিখানোই ছিল এই ট্রেনিং প্রোগ্রামের উদ্দেশ্য। এছাড়া আমাদেরকে মাঝে মাঝে কলকাতার ধর্মতলা, শিয়ালদা, ডালহৌসি, শ্যামবাজারসহ বিভিন্ন এলাকায় নিয়ে ছেড়ে দেওয়া হতো, কীভাবে সন্দেহজনক কাউকে ফলো করতে হয় এবং কেউ আমাকে ফলো করছে কিনা সেটাই বা কীভাবে বুঝতে হয় এসব হাতে কলমে শিক্ষার উদ্দেশ্যে। কখনও নতুন এলাকায় গিয়ে পড়লে এই এলাকায় নতুন আগমন সেটা কাউকে বুঝতে না দিয়ে কীভাবে প্রয়োজনীয় ঠিকানা খুঁজে নিতে হয় এবং লোক জনের চলাচল দেখে কীভাবে বাজার, ঘাট, স্টেশন ইত্যাদির অবস্থান এবং দিক বুঝে নিতে হয় সেসবও হাতে কলমে শিখানো হতো।

এ সময়ে কলকাতায় নক্সাল আন্দোলন খুবই তুঙ্গে ছিল, পুলিশের সদস্যরা নিজেরাই কোমরে শিকল দিয়ে তাদের অস্ত্র আটকে নিয়ে চলাফেরা করতো। পাড়ায় পাড়ায়, সন্দেহজনক স্হানে যখন-তখন ঘেরাও করে সি.আর.পি. (ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারের অধীন 'সেন্ট্রাল রিজার্ভ পুলিশ') অভিযান চলছিল, আমরা যাতে এসবের মধ্যে না পড়ি সে কারণে আমাদেরকে বিশেষ 'চিরকুট' দেওয়া হতো এবং বলা ছিল ধরা পড়লে শুধু মাত্র সি.আর.পি'র ইউনিট কমান্ডার বা অফিসারকে এটি দেখাতে। এভাবে আমাদেরকে প্রায় ২০দিন ট্রেনিং দেওয়া হল, এরপর আমরা ট্রেনিং শেষে ৩জন (যশোর, মাদারীপুর এলাকার লিডার এবং আমি) একসঙ্গে দেশে ফেরার প্রস্তুতি নিলাম। আগে কোরিয়ারের বিশ্বাসঘাতকতার একটি ঘটনার কারণে আমরা কোনও কোরিয়ার না নিয়েই দেশে ঢুকার সিদ্ধান্ত নিলাম। আমাদের সাথে ছোট অস্ত্র সাব-মেশিনগান (S.M.G.) দিয়ে যশোরের ঝিকরগাছা সীমান্তে এনে ছেড়ে দেওয়া হল।

ও আমার দেশের মাটি

দেশের মাটিতে পা রেখে প্রাণ ভরে নিশ্বাস নিলাম, বুকটা ভরে উঠল আনন্দে, মনে হল, এখন মৃত্যু হলেও দু:খ নেই। এরপর আমরা যেহেতু ৩ জনের ছোট দল এবং সঙ্গে কোনও কোরিয়ারও নেই তাই সিদ্ধান্ত নিলাম দিনের বেলায় হাটা এবং রাতে বিশ্রাম নেওয়ার। ঝিকরগাছা এলাকা দিয়ে দিনভর হেটে রাতে এক গ্রামের স্কুল ঘরে বেঞ্চের উপর ঘুমালাম, পরদিন খুব ভোরে উঠে সাবধানে যশোর-কালিগঞ্জ রাস্তা পার হলাম। এটাই এদিককার মধ্যে সবচেয়ে বিপজ্জনক এলাকা, কেননা, পাকিস্তানি মিলিটারি এবং তাদের দোসর রাজাকারদের পাশাপাশি এই এলাকায় পিকিংপন্থী চরমপন্থী কমিউনিস্ট গ্রুপগুলো খুবই সক্রিয় ছিল। পাকিস্তানের প্রতি চীনের সমর্থন ছাড়াও ভারতের সাহায্য নিয়ে আমরা মুক্তিযুদ্ধ চালাচ্ছিলাম বলে আমাদের সঙ্গে চরমপন্থী কমিউনিস্ট গ্রুপগুলোর তখনও কোনো প্রকার রাজনৈতিক মিত্রতা গড়ে উঠেনি, যদিও পূর্ববাংলার স্বাধীনতার প্রশ্নে আমাদের সঙ্গে মাঠ পর্যায়ের কর্মিদের তাদের কোনও দ্বিমত ছিল না। যাহোক, রাস্তা পার হয়ে কিছুটা ভিতরে ঢুকার পর আমাদের সঙ্গের যশোর এলাকার লীডার তাঁর গন্তব্যের পথে বিদায় নিলেন।

এবার আমরা ২জন (মাদারীপুরের লীডার এবং আমি) রাস্তা এবং দিক বুঝে নিয়ে হাঁটা দিলাম, সামনে বিশাল বিল, বিলের ওপারে রাস্তা, রাস্তা পার হয়ে খাল বিলের মাঝ খান দিয়ে নৌকায় গোপালগঞ্জ যাওয়ার পথ এবং যতদূর জানা গেল ওদিকের খাল বিলের পথ মোটামুটি নিরাপদ। ভরা বর্ষা কাল, বুক সমান পানি ঠেলে বিলের মধ্য দিয়ে ভিটে বাড়ির আড়াল আবডাল বেছে নিয়ে চলছি যাতে সামনের রাস্তা থেকে আমাদেরকে দেখা না যায়। বিলের দুইতৃতীয়াংশ পার হওয়ার পর হঠাৎ স্হানীয় এক যুবক নৌকায় এসে আমাদেরকে সতর্ক করে দিয়ে গেল সামনের রাস্তায় রাজাকাররা ঘোরা ফেরা করছে- এই বলে। সে আমাদেরকে পাশে এক পরিত্যক্ত বাড়িতে অপেক্ষায় রেখে বলে গেল রাস্তা বিপদমুক্ত হলে নিজেই এসে আমাদেরকে নিয়ে যাবে। তাৎক্ষণিকভাবে কিছুটা ঘাবড়ে গেলেও লোকটা চলে যাওয়ার পরে আমাদের কাছে ওর কথা বার্তা নিয়ে সন্দেহ দেখা দিল। কেননা, আমরা অনেক্ষণ থেকে রাস্তার দিকে চোখ রেখেই বিলের মধ্য দিয়ে হাটছিলাম কিন্তু আমাদের চোখে তেমন কোনও সন্দেহজনক গতিবিধি নজরে আসে নি। এমন সময়ে বাইরে কয়েকজন ছোট ছোট ছেলেমেয়ের আওয়াজ পেয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে দেখি ওরা বিলে মাছ ধরতে এসেছে। খালি ঘরে ভিনদেশী আমাদেরকে ভেজা জামা-কাপড়ে দেখে ওরা বুঝে গেল আমরা 'মুক্তি' এরপর জিজ্ঞেস করতেই জানা গেল, যে লোকটা কিছুক্ষণ আগে

আমাদেরকে এখানে তুলে দিয়ে গেছে সে এই এলাকার 'শান্তি কমিটির সদস্য'[১৮]। আর মুহুর্তকাল বিলম্ব না করে তখনই বিলের বুক সমান পানির মধ্য দিয়ে যতদ্রুত সম্ভব হাটতে থাকলাম এবং ভালোয় ভালোয় বিল ও রাস্তা পার হয়ে ওপাড়ে গিয়ে হাফ ছাড়লাম।

রাস্তার ওপাশে কিছুদূর গিয়ে খালে অনেকগুলো নৌকা পেলাম। এক নৌকার মাঝি খবর দিল গোপীনাথপুর হাই স্কুলে মুক্তিবাহিনীর ছেলেরা ক্যাম্প করেছে, এখান থেকে মাত্র ঘন্টা তিনেকের পথ, সেই ক্যাম্পে ভারত থেকে ট্রেনিং প্রাপ্ত ওর এক দেশের ছেলে আছে বলেও সে জানাল, তখন নাম বলাতে চিনতে পারলাম। ওর নৌকাতেই উঠলাম, মাঝি নিজের জন্যে রাতের খাবার রেধে রেখেছিল প্রচন্ড ক্ষুধায় সেই খাবার আমরা দু'জনে খেয়ে নিলাম। নৌকা চালাতে চালাতে মাঝির কাছ থেকে এদিককার অনেক খবর পাওয়া গেল, এই এলাকা দিয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের যাতায়াত বেড়েছে যেনে স্বস্তি পেলাম। এসব এলাকার মাঝিরা অনেকদূর পর্যন্ত যাতায়াত করে, এছাড়া ওকে মুক্তিবাহিনীর একজন প্রকাশ্য সমর্থক মনে হচ্ছিল, আমার সঙ্গের জন মাদারীপুর যাবে শুনে সে নিজেই তাকে মাদারীপুরে নামিয়ে দিয়ে আসতে আগ্রহ প্রকাশ করল। এভাবে প্রায় ৪ঘন্টার উপর নৌকায় কাটানোর পর রাতে আমরা গোপীনাথপুর ক্যাম্পে গিয়ে পৌছলাম। নেতৃস্হানীয়রা ছাড়া ভারত থেকে ট্রেনিংনিয়ে আসা সবাইকেই সেখানে পাওয়া গেল, এছাড়া বেশ কিছু স্হানীয় রিক্রুটও ছিল। আমার সঙ্গের মাদারীপুর অঞ্চলের লীডার এবং মাঝির খাওয়া এবং থাকার ব্যবস্হা করে দেওয়া হল, পরদিন ভোরেই ওরা গন্তব্য পথে রওয়ানা হবে।

---

[১৮] ২৫শে মার্চের পরে পাকিস্তানি মিলিটারিরা পূর্বপাকিস্তানে সকল বেসামরিক প্রশাসন ব্যাবস্থা ভেঙ্গে দেয়। প্রশাসনিক শূন্যতা পূরনের জন্যে ও মুক্তিবাহিনীর গতিবিধি নিয়ন্ত্রনের উদ্দেশ্যে পাকিস্তানপন্থী রাজনৈতিক দলগুলো থেকে পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিটি এলাকায় 'শান্তি কমিটি' গঠন করা হয়।

ক্যাম্পে পৌছানোর পর সে রাতে আর ঘুম হল না, বুভুক্ষের মতো সবাই ছেকে ধরেছে তাদের মনে জমা মুক্তিযুদ্ধ, যুদ্ধ পরবর্তি রাজনীতি ও সমাজব্যাবস্হা ইত্যাদি বিষয়ে হাজারো প্রশ্ন নিয়ে। অনেকদিন পরে বাংলার মাটিতে বসে মন-প্রাণ খুলে আমাদের স্বপ্নের ভবিষ্যত নিয়ে আলাপ করতে পেরে নিজেরই বুক ভরে উঠছিল উচ্ছাস আর আবেগে। এক এক করে ক্যাম্পের সবার সঙ্গে পরিচয় হল, ভারতে ট্রেনিং প্রাপ্ত ছাড়াও উল্লেখযোগ্য কিছু স্হানীয় রিক্রুট ছিল, এদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের মেধাবী ছাত্র মকবুল আহমেদ খান, সকলের প্রিয় 'মিঞা ভাই' অলিখিত নিয়মে তিনিই ক্যাম্প চালাতেন।

ক্যাম্পে এসে সে সময়ে যাদেরকে পেয়েছি তাদের মধ্যে ভারত থেকে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত- জহিরুল আলম বাবর, মীরাজ খান ঠাকুর, সর্দার মোশারফ হেসেন (অস্ত্রাগার ইন-চার্জ), পিটার গাইন, এমদাদ চৌধুরী, লিয়াকত হোসেন দাড়িয়া (লুলু), আব্দুর রহমান, হাসান, মিঠু সর্দার, মতিউর রহমান মতি, সর্দার রইসুল আমিন (রইস), বদর খান ঠাকুর, গাজী রওশন, বোরহান, ইউনুস, নাসির, সারা, সেলিম উজির, মুরাদ উজির, ফারুখ, মোখলেসুর রহমান সেন্টু, রবিউল ইসলাম সেন্টু, ভাটিয়াপাড়ার বদর প্রমুখ। স্হানীয় রিক্রুটদের মধ্যে ছিলেন মকবুল আহমেদ খান, মোশারফ হোসেন, খেপু কাজী, সনো প্রমুখ।

দীর্ঘ আলাপ আলাচনার পর প্রায় শেষ রাতের দিকে, মকবুল আহমেদ খান বললেন চলেন বাইরে হেটে আসি। বাইরে বের হয়ে আমাকে জড়িয়ে ধরে বললেন, 'আপনি জিতে গেছেন', আপনি আসার আগে আপনার সম্পর্কে অনেক কথাই বলা হয়েছে কিন্তু আপনার সঙ্গে আলাপের পর সবাই খুশি এবং সন্তুষ্ট হয়েছে। এতদিন ওরা এই কথাগুলো শুনতে চেয়েছে কিন্তু উত্তর দেওয়ার কেউ ছিল না।'

গোপালগঞ্জে তখন যে কয়েকটি বাহিনী সক্রিয় ভাবে কাজ করছিল তাদের মধ্যে সামরিক বাহিনীর সদস্য হেমায়েত উদ্দিনের নেতৃত্বে কোটালীপাড়া এলাকায় 'হেমায়েত বাহিনী', ন্যাপ- এবং ছাত্র ইউনিয়নের নেতৃত্বে গোপালগঞ্জ সদর ও কোটালীপাড়া এলাকায় 'কমলেশ/ওলিউর রহমান লেবু বাহিনী', সামরিক বাহিনীর আর এক সদস্য সৈয়দ নওশের আলীর নেতৃত্বে গোপালগঞ্জ সদর উত্তর-পূর্ব এলাকায় 'মুক্তি বাহিনী ইউনিট' এ ছাড়াও ইমাম এর নেতৃত্বে 'মুক্তি বাহিনীর' আর একটি ক্যাম্প ছিল পাইককান্দি হাই স্কুলে। কাশিয়ানি থানার ওড়াকান্দি গ্রামে বৃহত্তর ফরিদপুর এলাকার 'মুক্তি বাহিনী' (এফ.এফ.) ক্যাম্প ছিল ক্যাপ্টেন বাবুলের নেতৃত্বে। মুজিব বাহিনীর (বি.এল.এফ.) দায়িত্বপ্রাপ্ত স্হানীয় নেতা ইসমত কাদির

গামা সেসময়ে তাঁর নিজস্ব লোকজন নিয়ে ওই ওড়াকান্দি ক্যাম্পেই অবস্হান করতেন।

মূলত টহল, এমবুশ এবং ছোট খাট ২/১টি অপারেশন করেই আমাদের দিন কেটে যাচ্ছিল। গোপীনাথপুর হাই স্কুল ক্যাম্প থেকে আমরা বি.এল.এফ. সদস্যরা সে সময়ে পশ্চিম গোপালগঞ্জ এলাকাটি নিয়ন্ত্রণ করতাম এবং বিশেষ করে মধুমতি নদীর পাড় ধরে টহল দিতাম। নভেম্বর মাসে যুদ্ধের হাওয়া পাল্টাতে শুরু করল, বিভিন্ন যায়গা থেকে মুক্তাঞ্চলের খবর আসছিল, খোদ ঢাকা শহরেই এ সময়ে পাকিস্তানি মিলিটারির উপর হামলার খবর পাওয়া গেল। গোপালগঞ্জ শহর এলাকা থেকেও আর্মিরা আর আগের মতো যখন তখন বের হয় না[১৯]। রাজাকার এবং তাদের সহযোগীরা পরিস্হিতি আঁচ করতে পেরে সকলেই গ্রাম ছেড়ে শহরে গিয়ে পাকিস্তানি মিলিটারির ছত্রছায়ায় আশ্রয় নিয়েছে। মানুষজন গ্রামের হাটবাজারে, চায়ের এবং মুদির দোকানে ভীড় করে প্রকাশ্যেই স্বাধীন বাংলা বেতারের অনুষ্ঠান শুনত। আমরাও আস্তে আস্তে আমাদের টহল এলাকার পরিধি বাড়িয়ে দিচ্ছিলাম।

ধীরে ধীরে অবস্হা নিজেদের নিয়ন্ত্রণে চলে আসায় আমার বাবা, মা, ভাই, বোন সবার খোঁজ নিতে ইচ্ছা হল। একদিন রাতে কোমরে কয়েকটি হ্যান্ড গ্রেনেট ঝুলিয়ে এবং ঘাড়ে একটি এস.এম.জি. নিয়ে পরিচিত একটি নৌকা ঠিক করি, আমার গ্রামের বাড়ির উদ্দেশ্যে, একাই বের হব বলে প্রস্তুত হলাম, কিন্তু পিটারকে কিছুতেই রেখে আসতে পারলাম না। আমি এই ক্যাম্পে আসার পর থেকে পিটার গাইন আমার পিছনে ছায়ার মতো লেগে থাকত, ওর সব সময় ভয় ছিল আমাকে একা বা অসতর্ক পেলে, যারা , ইতোপূর্বে আমার বিরুদ্ধে নানা রকম কথা বানিয়ে বলেছে, তারা আমার কোনও ক্ষতি করে ফেলবে। ৫-২´ উচ্চতার সদা হাসিমুখের ছোটখাট এই ছেলেটি ক্যাম্পে সকলেরই প্রিয় পাত্র ছিল। মন ছিল আকাশের মতো বিশাল আর দেশের প্রতি তাঁর ছিল অদম্য অকৃতিম ভালবাসা। পিটার মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেওয়ার আগে ঢাকার ফার্মগেটে বোনের বাসায় থেকে জগন্নাথ কলেজে পড়ত, পরে ভারতের তান্দুয়া থেকে ট্রেনিং নিয়ে গোপালগঞ্জে আসে। মাটি, মানুষ আর সহযোদ্ধাদের প্রতি অকৃতিম

---

[১৯] নদী,খাল, বিল বেস্টিত গোপালগঞ্জ থেকে আর্মিদের চলাচলের মূল বাহন ছিল লঞ্চ। প্রথম দিকে আমরা দূর থেকে কয়েকটি লঞ্চের ইঞ্জিনের ধূয়া পরপর দেখলেই আর্মিদের মুভমেন্ট বুঝে যেতাম এবং সেই অনুযায়ি প্রস্তুতি নিয়ে নদীর পাড় দিয়ে প্রতিরোধ গড়ে তুলতাম। পরবর্তীতে মিলিটারিরা এটা বুঝতে পেরে তাদের লঞ্চের ইঞ্জিনের ধূয়া বের হওয়ার পাইপটিকে বাকিয়ে পানির মধ্যে দিয়ে দেয় যাতে দূর থেকে কোনোভাবে ইঞ্জিনের ধূয়া দেখা না যায়। এরকম পরিস্থিতিতে আর্মিদের মুভমেন্ট বুঝার জন্য আমাদেরকে সর্বক্ষণ নদীর পাড় দিয়ে টহলের ব্যবস্থা করতে হয়।

ভালবাসার টানে দেশ স্বাধীন হওয়ার পরেও গোপালগঞ্জ এলাকায় গণমানুষের সংগ্রামে নিজেকে জড়িয়ে রেখেছিল। পরবর্তীতে রক্ষী বাহিনীর নির্মম হামলায় শাহাদত বরণ করে। যাহোক, অবশেষে পিটারকে নিয়েই রওয়ানা দিতে হল। ভেন্নাবাড়ি পৌছে পিটারকে আমার নানার বাড়ির কাছে নৌকায় বসিয়ে রেখে, প্রায় মাঝ রাতের দিকে, বাড়ির ভেতরে ঢুকতেই আমাদের পরিবারের বাবা, মা, ভাই (আমার ছোট ভাই এস. এম. সাইদ হোসেনকে ছাড়া, সে আগেই পূর্ব বাংলা সর্বহারা পার্টির ক্যাম্পে যোগ দিয়েছে এবং আমরা তখন পর্যন্ত কেউই তার কোনও খবর জানতাম না), বোন সবাইকে পেয়ে গেলাম। ঢাকার পরিস্হিতি ক্রমেই খারাপ হতে থাকায় মাত্র কয়েকদিন আগে একটি বড় নৌকা ভাড়া করে সবাই মিলে গ্রামে চলে এসেছে। সবার সঙ্গে দেখা হওয়ার পর মনটাও ভালো হল, কিছুক্ষণ থাকার পর আর দেরি না করে সে রাতেই ক্যাম্পে ফিরে এলাম।

নভেম্বর মাস থেকেই চারদিকে মুক্তাঞ্চল গঠন এবং মুক্তিবাহিনীর বিজয়ের খবর আসতে থাকে। আমাদেরও টহল এলাকার পরিধি ধীরে ধীরে বিস্তৃতি পেতে থাকে, গোপালগঞ্জের সাথে যশোর, খুলনা সীমানা এলাকায় মধুমতি নদীর পাড় দিয়ে আমাদের নিয়মিত টহল চলছিল। এ সময়ে শুধুমাত্র গোপালগঞ্জ শহর ছাড়া বাকি সব এলাকাই কার্যত মুক্তিবাহিনীর নিয়ন্ত্রণে চলে আসে। ৩রা ডিসেম্বর ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে আনুষ্ঠানিক যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। যৌথ বাহিনীর (মুক্তিবাহিনী এবং ভারতীয় বাহিনী) সার্বিক অভিযান শুরু হলে, ইতোমধ্যে মুক্তি বাহিনীর হামলায় শারীরিক এবং মানসিক ভাবে পর্যদুস্ত, পাকিস্তানি সেনা বাহিনী আত্মরক্ষার জন্যে দ্রুত তাদের মূল ঘাঁটি ক্যান্টনমেন্ট এলাকার দিকে সরে যেতে থাকে। ৮ই ডিসেম্বর গভীর রাতে আমরা মধুমতি নদী দিয়ে বেশ কয়েকটি লঞ্চ একত্রে চলাচলের শব্দ পেলাম। আমাদের পেট্রোল বাহিনীর কাছ থেকে খবর পাওয়া গেল পাকিস্তানি সেনারা তাদের রাজাকার সাঙ্গ-পাঙ্গসহ গোপালগঞ্জ শহর ছেড়ে পালিয়েছে। পরদিন খুব ভোরেই আমরা গোপীনাথপুরের ক্যাম্প গুটিয়ে গোপালগঞ্জ শহরের দিকে মার্চ করি এবং মুক্তি বাহিনীর অন্য সব গ্রুপের আগে শহরে পৌছে সদর পুলিশ থানায় অবস্হান নেই এবং শহরের প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ ভার গ্রহণ করি।

আমাদের প্রাথমিক দায়িত্ব হয় শহরের দিকে ছুটে আসা মুক্তি বাহিনীর বিভিন্ন ইউনিট গুলোর মধ্যে সমন্বয় সাধন করা, তাদের থাকার ব্যবস্থা করা এবং আইন শৃংখলা পরিস্হিতি নিয়ন্ত্রণে আনা। রাজাকার এবং তাদের সহযোগীরা ইতোমধ্যেই শহর ছেড়ে পালিয়েছে কাজেই তাদেরকে নিয়ে সেমূহুর্তে আমাদের কোনও সমস্যা বা মাথা ব্যথা ছিল না। সমস্যা দেখা দেয় ক্ষতিগ্রস্ত মুক্তিযোদ্ধাদেরকে নিয়ে, যাদের বাড়ি ঘর পাক বাহিনীর দালালরা লুটপাট করে পুড়িয়ে দিয়েছে অথবা পরিবার পরিজনকে শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত করেছে, তারা অস্ত্রসহ গ্রামে ফিরে গিয়ে দালালদের অথবা

তাদের পরিবার পরিজনের উপর প্রতিশোধ গ্রহণে উন্মুখ ছিল। পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার জন্যে এ সময়ে অস্ত্রসহ ক্যাম্প ত্যাগ করার উপর কঠোর নিষেধাজ্ঞা দেয়া হয়। কেউ গ্রামের বাড়ি যেতে চাইলে তার অস্ত্র জমা রেখে একটি স্লিপ দেয়া হতো। অবশ্য এ রকম ছুটিতে যেতে চাওয়া মুক্তিযোদ্ধাদের সংখ্যা ছিল খুবই কম, মুক্তির আনন্দ প্রাণভরে সহযোদ্ধাদের সাথে উপভোগ করার জন্যে সবাই একসঙ্গে-একস্থানে থাকতেই বেশি আগ্রহী ছিল।

১০তারিখ সকালে কয়েকটি ভারতীয় মিগ যুদ্ধ বিমান গোপালগঞ্জ শহরের খুব নিচুঁ দিয়ে উড়ে গেল, এ সময়ে আমরা যেনো ভুল হামলার শিকার হয়ে না পড়ি সে কারণে শহরে মাইকিং করে প্রতিটি বাড়িতে বাংলাদেশের পতাকা উড়ানোর জন্য ঘোষণা দেওয়া হল। বিকালের দিকে আবারও কয়েকটি মিগ যুদ্ধ বিমান এসে চারদিকে বাংলাদেশের পতাকা দেখে পরিস্থিতি বুঝে নিয়ে চলে যায়। ঘাটিতে ফিরে এই বিমানগুলোই সম্ভবত গোপালগঞ্জ শত্রু মুক্ত হওয়ার খবর দেয়, যার ফলে, পরদিন থেকে দলে দলে সব স্মরণার্থীরা তাদের বাড়ি ঘরে ফেরত আসতে শুরু করে। গোপালগঞ্জ আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দও কয়েকদিনের মধ্যে শহরে এসে পৌছান এবং আমরা তাদের হাতে প্রশাসনিক দ্বায়িত্ব বুঝিয়ে দিয়ে নিজেরা হাল্কা হই।

ইতোমধ্যে ১৯৭১-এর ১৬ ডিসেম্বর বিকেল ৪টা ৩১ মিনিট ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে (সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ডার জেনারেল নিয়াজীর আত্মসমর্পণের ঐতিহাসিক দলিল স্বাক্ষরের মধ্য দিয়ে ঢাকা হানাদার শত্রু মুক্ত হয়, আমিও গোপালগঞ্জের সাথীদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ২০তারিখে ঢাকার উদ্দেশ্যে যাত্রা করি।

প রি শি ষ্ট

(ছাত্র সমাজের ১১-দফা)

সংগ্রামী ছাত্র সমাজের ডাক

১১-দফার দাবিতে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়িয়া তুলুন

স্বৈরাচারী সরকারের দীর্ঘ দিনের অনুসৃত জনস্বার্থ বিরোধী নীতির ফলেই ছাত্র সমাজ ও দেশবাসীর জীবনে সংকট ক্রমশ বৃদ্ধি পাইয়া চলিয়াছে। শাসন শোষনে অতিষ্ঠ হইয়া ছাত্র-জনতা ছাত্র-গণ আন্দোলনের পথে আগাইয়া আসিয়াছেন।

আমরা ছাত্র সমাজ ও দেশবাসীর স্বার্থে নিম্মোক্ত ১১-দফার দাবীতে ব্যাপক ছাত্র-গণ আন্দোলনের আহ্বান জানাইতেছি:

১. (ক) সচ্ছল কলেজসমূহকে প্রাদেশিকীকরণের নীতি পরিত্যাগ করিতে হইবে এবং জগন্নাথ কলেজসহ প্রাদেশিকীকরণকৃত কলেজসমূহকে পূর্বাবস্থায় ফিরাইয়া দিতে হইবে।

(খ) শিক্ষার ব্যাপক প্রসারের জন্য প্রদেশের সর্বত্র বিশেষ করিয়া গ্রমাঞ্চলে স্কুল-কলেজ স্থাপন করিতে হইবে এবং বেসরকারি উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত স্কুল-কলেজসমূহকে সত্বর অনুমোদন দিতে হইবে। কারিগরি শিক্ষা প্রসারের জন্য পর্যাপ্ত সংখ্যক ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, পলিটেশনিক, টেশনিক্যাল ও কমার্সিয়াল ইনস্টিটিউট স্থাপন করিতে হইবে।

(গ) প্রদেশের কলেজসমূহে দ্বিতীয় শিফটে নৈশ আই.এ., আই.এসসি., আই.কম. ও বি.এ., বি.এসসি., বি.কম. এবং প্রতিষ্ঠিত কলেজসমূহে নৈশ শিফটে এম.এ. ও এম.কম. ক্লাস চালু করিতে হইবে।

(ঘ) ছাত্র বেতন শতকরা ৫০ ভাগ হ্রাস করিতে হইবে। স্কলারশীপ ও স্টাইপেন্ডর সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে হইবে। এবং ছাত্র আন্দোলনে অংশগ্রহণ করার অপরাধে স্কলারশীপ ও স্টাইপেন্ড কাড়িয়া লওয়া চলিবে না।

(ঙ) হল, হেস্টেলের ডাইনিং হল ও কেন্টিন খরচার শতকরা ৫০ ভাগ সরকার কতৃক 'সাবসিডি' হিসাবে প্রদান করিতে হইবে।

(চ) হল ও হোস্টেল সমস্যার সমাধান করিতে হইবে।

(ছ) মাতৃভাষার মাধ্যমে সর্বস্তরে শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে। অফিস আদালতে বাংলা ভাষা চালু করিতে হইবে। সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পর্যাপ্ত সংখ্যক অভিজ্ঞ শিক্ষকের ব্যবস্থা করিতে হইবে। শিক্ষকের বেতন বৃদ্ধি করিতে হইবে এবং স্বাধীন মতামত প্রকাশের অধিকার দিতে হইবে।

(জ) অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক করিতে হইবে। নারী শিক্ষার ব্যাপক প্রসার করিতে হইবে।

(ঝ) মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করিতে হইবে এবং অটোমেশন প্রথা বিলোপ, নমিনেশনে ভর্তি প্রথা বন্ধ, মেডিকেল কাউন্সিল অর্ডিন্যান্স বাতিল, ডেন্টাল কলেজকে পূর্নাঙ্গ কলেজে পরিণত করা প্রভৃতি মেডিকেল ছাত্রদের দাবী মানিয়া লইতে হইবে। নার্স ছাত্রীদের সকল দাবী মনিয়া লইতে হইবে।

(ঞ) প্রকৌশল শিক্ষার অটোমেশন প্রথা বিলোপ, ১০% ও ৭৫% রুল বাতিল, সেন্ট্রাল লাইব্রেরীর সুব্যবস্থা, প্রকৌশল ছাত্রদের শেষবর্ষেও ক্লাস দেওয়ার ব্যবস্থাসহ সকল দাবী মানিয়া লইতে হইবে।

(ট) পলিটেকনিক ছাত্রদের 'কনডেন্স কোর্সের' সুযোগ দিতে হইবে এবং বোর্ড ফাইনাল পরীক্ষা বাতিল করিয়া একমাত্র সেমিস্টার পরীক্ষার ভিত্তিতেই ডিপ্লোমা দিতে হইবে।

(ঠ) টেক্সটাইল, সিরামিক, লেদার টেকনলজি এবং আর্ট কলেজ ছাত্রদের সকল দাবি অবিলম্বে মানিয়া লইতে হইবে। আই.ই.আর. ছাত্রদের দশ-দফা, সমাজ কল্যাণ কলেজ ছাত্রদের, এম.বি.এ. ছাত্রদের ও আইনের ছাত্রদের সমস্ত দাবি মানিয়া লইতে হইবে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ে বাণিজ্য বিভাগকে আলাদা 'ফ্যাকাল্টি' করিতে হইবে।

(ড) কৃষি বিদ্যালয় ও কলেজ ছাত্রদের ন্যায্য দাবি মানিয়া লইতে হইবে। কৃষি ডিপ্লোমা ছাত্রদের 'কনডেন্স কোর্সের' দাবিসহ কৃষি ছাত্রদের সকল দাবি মানিয়া লইতে হইবে।

(ঢ) ট্রেনে, ষ্টিমারে ও লঞ্চে ছাত্রদের 'আইডেন্টিটি কার্ড' দেখাইয়া শতকরা পঞ্চাস ভাগ 'কন্সেসনে' টিকেট দেওয়ার ব্যবস্থা করিতে হইবে। মাসিক টিকেটেও এই 'কন্সেসন' দিতে হইবে। পশ্চিম পাকিস্তানের মতো বাসে ১০ পয়সা ভাড়ায় শহরের যে কোন স্থানে যাতায়াতের ব্যবস্থা করিতে হইবে। দূরবর্তী অঞ্চলে বাস যাতায়াতেও শতকরা ৫০ ভাগ 'কন্সেসন' দিতে হইবে। ছাত্রীদের স্কুল-কলেজে যাতায়াতের জন্য পর্যাপ্ত বাসের ব্যবস্থা করিতে হইবে। সরকারি ও আধা-সরকারি উদ্যোগে আয়োজিত খেলাধূলা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে ছাত্রদের শতকরা ৫০ ভাগ 'কন্সেসন' দিতে হইবে।

(ণ) চাকুরির নিশ্চয়তা বিধান করিতে হইবে।

(ত) কুখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয় অর্ডিন্যান্স সম্পূর্ণ বাতিল করিতে হইবে এবং বিশ্ববিদ্যালয়সহ অন্যান্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন দিতে হইবে।

(থ) শাসকগোষ্ঠীর শিক্ষা সংকোচন নীতির প্রামান্য দলিল জাতীয় শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট ও হামদুর রহমান কমিশন রিপোর্ট সম্পূর্ণ বাতিল করিতে হইবে ছাত্র সমাজ ও দেশবাসীর স্বার্থে বহুমুখী ও বৈজ্ঞানিক শিক্ষাব্যবস্থা কায়েম করিতে হইবে।

২। প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটে প্রত্যক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে পার্লামেন্টারী গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। বাক স্বাধীনতা এবং সংবাদপত্রের স্বাধীনতা দিতে হইবে। দৈনিক ইত্তেফাক পত্রিকার উপর হইতে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করিতে হইবে।

৩। নিম্মলিখিত দাবিসমূহ মানিয়া লইবার ভিত্তিতে পূর্ব-পাকিস্তানকে পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন দিতে হইবেঃ

(ক) দেশের শাসনতান্ত্রিক কাঠামো হইবে ফেডারেশন শাসনতান্ত্রিক রাষ্ট্রসংঘ এবং আইন পরিষদের ক্ষমতা হইবে সার্বভৌম।

(খ) ফেডারেল সরকারের ক্ষমতা দেশরক্ষা, বৈদেশিক নীতি ও মুদ্রা এই কয়টি বিষয়ে সীমাবদ্ধ থাকিবে। অপরাপর সকল বিষয়ে অঙ্গরাষ্ট্রগুলির ক্ষমতা হইবে নিরঙ্কুশ।

(গ) দুই অঞ্চলের জন্য একই মুদ্রা থাকিবে। এই ব্যবস্থায় মুদ্রা কেন্দ্রের হাতে থাকিবে। কিন্তু এই ব্যবস্থায় শাসনতন্ত্রে এমন সুনির্দিষ্ট থাকিতে হইবে যে, যাহাতে পূর্ব পাকিস্তানের মুদ্রা পশ্চিম পাকিস্তানে পাচার হইতে না পারে। এই বিধানে পাকিস্তানে একটি ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংক থাকিবে। দুই অঞ্চলে দুইটি পৃথক রিজার্ভ ব্যাংক থাকিবে এবং পূর্ব পাকিস্তানের জন্য পৃথক অর্থনীতি প্রবর্তন করিতে হইবে।

(ঘ) সকল প্রকার ট্যাক্স, খাজনা, কর ধার্য ও আদায়ের সকল ক্ষমতা থাকিবে আঞ্চলিক সরকারের হাতে। ফেডারেল সরকারের কোন কর ধার্য করিবার ক্ষমতা থাকিবে না। আঞ্চলিক সরকারের আদায়ী রেভিনিউর নির্ধারিত অংশ আদায়ের সঙ্গে সঙ্গে ফেডারেল তহবিলে জমা হইবে। এই মর্মে রিজার্ভ ব্যাংকসমূহের উপর বাধ্যতামূলক বিধান শাসনতন্ত্রে থাকিতে হইবে।

(ঙ) ফেডারেশনের প্রতিটি রাষ্ট্র বহিঃবাণিজ্যের পৃথক হিসাব রক্ষা করিবে এবং বহিঃবাণিজ্যের মাধ্যমে অর্জিত মুদ্রা অঙ্গ রাষ্ট্রগুলির এখতেয়ারাধীন থাকিবে। ফেডারেল সরকারের প্রয়োজনীয় বিদেশী মুদ্রা অঙ্গ রাষ্ট্রগুলি সমানভাবে অথবা শাসনতন্ত্রের নির্ধারিত ধারা অনুযায়ি প্রদান করিবে। দেশজাত দ্রব্যাদি বিনা শুল্কে অঙ্গ রাষ্ট্রগুলির মধ্যে আমদানি- রফতানি চলিবে। এবং ব্যবসা বাণিজ্য সম্পর্কে বিদেশী রাষ্ট্রগুলির

সাথে চুক্তি সম্পাদনের, বিদেশে ট্রেড মিশন স্থাপনের এবং আমদানি-রফতানি করিবার অধিকার অঙ্গ রাষ্ট্রগুলির হাতে ন্যস্ত করিয়া শাসনতন্ত্রে বিধান করিতে হইবে।

(চ) পূর্ব পাকিস্তানকে মিলিশিয়া বা প্যারামিলিটারি রক্ষী বাহিনী গঠনের ক্ষমতা দিতে হইবে। পূর্ব পাকিস্তানে অস্ত্র কারখানা নির্মাণ ও নৌবাহিনীর সদর দফতর স্থাপন করিতে হইবে।

৪। পশ্চিম পাকিস্তানের বেলুচিস্তান, উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, সিন্ধুসহ সকল প্রদেশের স্বায়ত্বশাসন প্রদান করত ও সাব-ফেডারেশন গঠন।

৫। ব্যাংক-বীমা, পাট ব্যবসা ও বৃহৎ শিল্প জাতীয়করণ করিতে হইবে।

৬। কৃষকের উপর হইতে খাজনা ও ট্যাক্সের হার হ্রাস করিতে হইবে এবং বকেয়া খাজনা ও ঋণ মওকুফ করিতে হইবে। সার্টিফিকেট প্রথা বাতিল ও তহশিলদারের অত্যাচার বন্ধ করিতে হইবে। পাটের সর্বনিম্ন মূল্য মণপ্রতি ৪০ টাকা নির্ধারণ এবং আখের ন্যায্য মূল্য দিতে হইবে।

৭। শ্রমিকের ন্যায্য মজুরি বোনাস দিতে হইবে এবং শিক্ষা, বাসস্থান, চিকিৎসা ইত্যাদির ব্যবস্থা করিতে হইবে। শ্রমিক স্বার্থ বিরোধী কালাকানুন প্রত্যাহার করিতে হইবে এবং ধর্মঘটের অধিকার ও ট্রেড ইউনিয়ন করার অধিকার প্রদান করিতে হইবে।

৮। পূর্ব পাকিস্তানে বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও জল সম্পদের সার্বিক ব্যবহারের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

৯। জরুরি আইন প্রত্যাহার, নিরাপত্তা আইন ও অন্যান্য নিবর্তনমূলক আইন প্রত্যাহার করিতে হইবে।

১০। সিয়াটো, সেন্টো, পাক-মার্কিন সামরিক চুক্তি বাতিল করিয়া জোট বহির্ভূত স্বাধীন ও নিরপেক্ষ পররাষ্ট্রনীতি কায়েম করিতে হইবে।

১১। দেশের বিভিন্ন কারাগারে আটক সকল ছাত্র, শ্রমিক, কৃষক, রাজনৈতিক কর্মী ও নেতৃবৃন্দের অবিলম্বে মুক্তি, গ্রেফতারী পরোয়ানা ও হুলিয়া প্রত্যাহার এবং আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলাসহ রাজনৈতিক কারণে জারীকৃত সকল মামলা প্রত্যাহার করিতে হইবে।

সংগ্রামী ছাত্র সমাজের পক্ষে

আবদুর রউফ

সভাপতি
পূর্ব-পাকিস্তান ছাত্রলীগ।

খালেদ মোহম্মদ আলী
সাধারণ সম্পাদক
পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ।

সাইফুদ্দিন আহমেদ মানিক
সভাপতি
পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন।

সামসুদ্দোহা
সাধারণ সম্পাদক
পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন।

মোস্তফা জামাল হায়দার
সভাপতি
পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন।

দীপা দত্ত
সহ-সম্পাদিকা
পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন।

তোফায়েল আহমেদ
সহ-সভাপতি
ডাকসু।

নাজিম কামরান চৌধুরী
সাধারণ সম্পাদক
ডাকসু।

ছাত্র সমাজের প্রচারপত্র
জানুয়ারি, ১৯৬৯

(১৯৭০ সালে ঢাকা শহর ছাত্রলীগের পক্ষ থেকে নবাগত কলেজ ছাত্রদের স্বাগত জানিয়ে বিতরণকৃত লিফলেট)

হে নবাগত ভাই বোনের

যে মুহূর্তে বাংলার মানুষ বন্যা কবলিত, যে মুহূর্তে সারা দেশ চরম রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা ও অর্থনৈতিক দেউলিয়াত্বের সম্মুখীন, সে মুহূর্তে স্কুল জীবনের ক্ষুদ্র পরিচয় থেকে মহাবিদ্যালয়ের বৃহত্তর অংগন আপনাদের আগমন জাতীয় জীবনের সকল ক্ষেত্রে সমস্যার আলোকে বিশেষ গুরুত্ব পূর্ণ ? শাসিত, শোষিত, ও নির্যাতিত বাংগালী জীবনের একমাত্র আশা যুব সমাজের অংশ হিসাবে আগামী দিনে দেশ, জাতি ও সমাজ গঠনে আপনাদের যে দায়িত্ব তা পালনের উপযুক্ত ক্ষেত্রে আপনারা উপস্থিত। সংগ্রামী বাংলার সংগ্রামী জীবনের এ মুহূর্তে ফুলের ডালি দিয়ে নয়, যত্ন করে গাঁথা মালা দিয়ে নয়, গান,-ছন্দ বা সুখের হাসি দিয়ে নয় বরং দেশ প্রেম, ত্যাগ, আত্মহুতি, নির্যাতন প্রভৃতির কথা চিন্তা করে গনজীবনের সমস্যা দূর করবার উদ্দেশ্যে এক সুন্দর সমাজ গঠনের মানষে আজকের যুব সমাজের যে প্রস্তুতি তার কথা স্মরণ করবার জন্য সংগ্রামী দু'হাত বাড়িয়ে আমরা আপনাদের গ্রহণ করছি।

পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ কেবল একটি নামই নয়, বাংলার স্বাধিকার আদায়ের জন্য ছাত্রলীগ এ সংগ্রামের একটি প্রতীক। ১৯৪৮ এর ৪ঠা জানুয়ারীর জন্মলগ্ন থেকে ৫২, ৫৬, ৬২, ৬৪, ৬৫, ৬৬ ও '৬৯ এর ঘটনাবলী একথাই প্রমান করে যে, বাংগালীর সার্বিক মুক্তির বারতা নিয়ে যে ছাত্রলীগ জন্মগ্রহণ করেছে— বাংলা ও বাংগালীর ভাগ্য নির্দ্ধারনের শেষদিন পর্য্যন্ত ছাত্রলীগ তার মত ও পথে অটল থাকবে। বহু ছাত্রলীগ কর্মীর প্রায় বিসর্জ্জন, কারাভোগ, ও নির্যাতন তার জলন্ত প্রমান।

প্রতিটি আন্দোলনে সুষ্ঠু নেতৃত্বদান ছাত্রলীগের অন্যতম বৈশিষ্ট আর সে কারনেই এ দেশের প্রায় প্রতিটি রাজনৈতিক দলের নেতৃত্বে রয়েছে ছাত্রলীগের এককালীন একনিষ্ট কর্মীরা। আমরা সে জন্য গর্বিত।

বাংলা ও বাংগালীর জীবনে আজ বড় দুর্দিন। বাংলার ভৌগলিক মর্য্যাদা ও বাংগালীর জাতিগত স্বত্বার স্বীকৃতির প্রশ্নে ৭ কোটি মানুষ চরম অগ্নি পরীক্ষার মুখোমুখি। সারা বাংলা আজ অধীর আগ্রহে তাকিয়ে আছে যুব সমাজের দিকে। কখন যুব বাংলা জেগে উঠবে, কখন যুব বাংলা সোচ্চারে ঘোষণা করে ছিন্ন করবে অতীতের

শৃঙ্খলকে, বাংগালীকে মুক্ত করবে শোষণ আর রক্তচক্ষুর শাসন হতে— কেবল বাংগালীরাই হবে বাংলার ভাগ্য নিয়ন্ত্রক যে চরম দিনটির জন্য অপেক্ষমান বাংলার সাত কোটিনর-নারী।

ক্ষুধা, দারিদ্র, অকালমৃত্যুর সাথী রাজনৈতিক ক্ষমতাহীন বাঙ্গালী জীবন এক নারকীয় যন্ত্রনার শিকার। দীর্ঘ তেইশ বছরে, কখনো পাকিস্তান রক্ষার নামে মুসলিম লীগের কেন্দ্রীয় শাসন, কখনো পূর্ব পাকিস্তানকে রক্ষার নামে জরুরী ব্যবস্থার প্রবর্তন (৯২-ক ধারা) আবার কখনো শান্তি-শৃঙ্খলার নামে সামরিক শাসন, আবার ভিন্নরূপে মৌলিক গনতন্ত্র পরিশেষের বর্তমানের সামরিক শাসনের যাতাকলে বাংলার ছাত্র শ্রমিক কৃষক ও নাগরিক জীবনের যে দুর্দ্দশা তার আলোকে সাতকোটি বাঙ্গালীর আজ একটি মাত্র ধ্যান ও ধারণা— 'কবে আমরা মুক্ত হব'? যুব জনতার নিকটই বাংলার মানুষের আজ এই একটি মাত্র প্রশ্ন।

সে প্রশ্নের উত্তরে পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগের আজকের যে আন্দোলন তার ভিত্তি চারটি—

১। বাংলার ভৌগলিক মর্যাদা ও বাঙ্গালী জাতি হিসাবে স্থায়ী স্বীকৃতি আদায় করা।

২। সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির ভিত্তিতে শোষনহীন সমাজ গঠন।

৩। মানুষের গণতান্ত্রিক চিন্তা ধারার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া।

৪। বাংলার কৃষ্টি, সংস্কৃতি ও সাহিত্যের পূর্ন বিকাশ ও প্রতিষ্ঠা স্থাপন করা।

বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদের উপরে বর্নিত কর্মসূচীর বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজন যুবসমাজের তথা ছাত্রলীগের একতা। আসুন, আজকের এ পরিচয়ের প্রথম দিনে আমাদের সংগ্রামী কাফেলায় আপনারাও শরীক হউন এবং বাংলার মুক্তি আন্দোলনকে সফল করুন। বাংলা ও বাঙ্গলীর জয় হোক। জয় বাংলা।

পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ, ঢাকা শহর শাখার পক্ষে—
সভাপতি— মোঃ মনিরুল হক।
সাধারন সম্পাদক—শেখ মোঃ জাহিদ হোসেন।

তজুল ইসলাম কর্তৃক ৪২ বলাকা ভবন, ঢাকা হইতে প্রকাশিত ও প্রচারিত।

(পাকিস্তান সামরিক জান্তার ২৫শে মার্চ হত্যাযজ্ঞ পরিকল্পনার বিস্তারিত বিবরণ)

অপারেশন সার্চ লাইট

পরিকল্পনার ভিত্তি

১. আওয়ামী লীগের কার্যকলাপ বিদ্রোহী কার্যকলাপ হিসাবে বিবেচিত হবে। যারা আওয়ামী লীগকে সমর্থন করে এবং সামরিক আইনে গৃহিত ব্যবস্থার বিরোধী তাদেরকেও বিদ্রোহী হিসাবে গণ্য করা হবে।

২. যেহেতু সামরিক বাহিনীর পূর্ব পাকিস্তানি সদস্যদের মধ্যে আওয়ামী লীগের ব্যাপক সমর্থন রয়েছে সেহেতু এই অপারেশন অত্যন্ত চতুরভাবে আকষ্মিক, দ্রুততা ও ক্ষিপ্রতা মিলিয়ে ঝটিকা হামলার মাধ্যমে শুরু করতে হবে।

সাফল্যের জন্য করণীয়

৩. এই অপারেশন একসঙ্গে প্রদেশব্যাপী শুরু করতে হবে।

৪. সর্বাধিক সংখ্যক রাজনৈতিক এবং ছাত্র নেতা ও চরমপন্থী শিক্ষক, সাংস্কৃতিক কর্মী গ্রেফতার করতে হবে। প্রাথমিক পর্যায়ে উপরের দিকের রাজনৈতিক নেতাদের এবং ছাত্র নেতাদের অবশ্যই গ্রেফতার করতে হবে।

৫. এই অপারেশন ঢাকায় ১০০%ভাগ সাফল্য অবশ্যই অর্জন করতে হবে। এবং এ জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দখল ও তল্লাসী চালাতে হবে।

৬. ক্যান্টনমেন্ট সমূহের নিরাপত্তা অবশ্যই সুনিশ্চিত করতে হবে। ক্যান্টনমেন্টে আক্রমণকারিদের বিরুদ্ধে অবাধ ও বেপরোয়াভাবে অগ্নেয়াস্ত্রের ব্যবহার করতে হবে।

৭. সব ধরনের অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক যোগাযোগ বন্ধ করে দিতে হবে। টেলিফোন এক্সচেঞ্জ, রেডিও, টেলিভিশন, টেলিপ্রিন্টার সার্ভিস এবং বৈদেশিক দূতাবাসের সংগে যোগাযোগ রক্ষাকারি ট্রান্সমিটারসমূহ বন্ধ করে দিতে হবে।

৮. পশ্চিম পাকিস্তানি সৈন্যরা পূর্ব পাকিস্তানি সেনা সদস্যদের নিরস্ত্র করবে ও প্রহরা এবং সমরাস্ত্র ডিপোর দায়িত্ব গ্রহণ করবে। পাকিস্তান বিমান বাহিনী এবং পূর্ব পাকিস্তান রাইফেলসেও একই নির্দেশ পালিত হবে।

হতবাক ও প্রবঞ্চনাকরার পদ্ধতি

৯. সর্বোচ্চ পর্যায়ে, রাজনৈতিক সংলাপ অব্যাহত রাখার আগ্রহের বিষয়টি বিবেচনার জন্য পেসিডেন্টকে অনুরোধ জানানো যাচ্ছে -এমনকি, শেখ মুজিবকে ধোঁকা দেওয়ার জন্য, প্রয়োজনে তাঁকে এমন আশ্বাসও দিতে হবে যে, জনাব ভুট্টো সম্মত

না হলেও তিনি আওয়ামী লীগের দাবি মেনে নিয়ে ২৫শে মার্চ একটি ঘোষণা দিবেন।

১০. আক্রমণ কৌশল-

(ক) যেহেতু অপারেশনের গোপনীয়তা রক্ষার বিষয়টি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সেই কারণে নিচে বর্ণিত প্রাথমিক কাজগুলো শহরের বিভিন্নস্থানে অবস্থানরত সেনা সদস্যদের দিয়েই করাতে হবে:

১। মুজিবের বাড়িতে প্রবেশ করে উপস্থিত সকলকে গ্রেফতার করতে হবে। বাড়িটি প্রহরী বেষ্টিত এবং সুরক্ষিত।

২। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান হলগুলো ঘেরাও করা - ইকবাল হল (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়), লিয়াকত হল (কারিগরী বিশ্ববিদ্যলয়)।

৩। টেলিফোন এক্সচেঞ্জ বন্ধ করা।

৪। যেসব বাড়িতে অস্ত্র সংগ্রহ করা হয়েছে সেসব বাড়ি চিহ্নিত করা।

(খ) টেলিফোন এক্সচেঞ্জ বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত ক্যান্টনমেন্ট এলাকায় সেনা চলাচল শুরু না করা।

(গ) অপারেশনের রাতে ১০টার পরে কাউকে ক্যান্টনমেন্ট এলাকা থেকে বের হতে না দেওয়া।

(ঘ) যে কোনও অযুহাতে প্রেসিডেন্ট হাউস, গভর্নর হাউস, এম.এন.এ হোস্টেল, রেডিও, টেলিভিশন এবং টেলিফোন এক্সচেঞ্জ এলাকায় সৈন্য সংখ্যা বাড়াতে হবে।

(ঙ) মুজিবের বাড়িতে অপারেশনের সময় প্রয়োজনে বেসরকারি গাড়ি ব্যবহার।

অভিযানের ধারাক্রম

১১. (ক) 'এইচ আওয়ার'- ঘটিকা রাত একটা

(খ) অভিযানের সময়

১। কমান্ডো (এক প্লাটুন) - মুজিবের বাড়ি — রাত ১টা।

২। টেলিফোন এক্সচেঞ্জের সুইচ বন্ধ — রাত ১২টা ৫৫মিনিট।

৩। বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা ঘেরাও — রাত ১টা ৫মিনিট।

৪। রাজারবাগ পুলিশ হেড কোয়ার্টার ও অন্যান্য থানায় সেনা প্রেরণ — রাত ১টা ০৫মিনিট।

৫। নিচের বাড়ি ঘেরাও:- — রাত ১টা ০৫মিনিট

মিসেস আনোয়ারা বেগমের বাড়ি, রোড নং-২৯, বাড়ি নং-১৪৮।

৬। কারফিউ জারি — রাত ১টা ১০মিনিট

সাইরেন (যোগাড় করে) এবং লাউড স্পীকারের সাহায্যে ঘোষনার মাধ্যমে। প্রাথমিক ভাবে ৩০ ঘ টার জন্য। প্রাথমিক পর্যায়ে কোনো কারফিউ পাশ ইস্যু

করা হবে না। প্রসব রোগী এবং গুরুতর হৃদ রোগীদের ক্ষেত্রে বিশেষ অনুরোধে সেনা দ্বারা স্থানান্তর বিবেচনা করা হবে। আরও ঘোষনা করতে হবে যে পরবর্তি আদেশ না দেওয়া পর্যন্ত কোনও খবরের কাগজ বের হবে না।

৭। নিজ নিজ সেক্টরে নির্দিষ্ট দায়িত্ব সহকারে সেনা প্রেরণ

রাত ১টা ১০মিনিট

হলসমুহ দখল ও তল্লাশী

৮। বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় সেনা প্রেরণ সকাল ০৫টা

৯। সড়ক ও নদী পথে তল্লাশী ঘাঁটি স্থাপন রাত ০২টা

(খ) দিনের বেলা অভিযান-

১। ধানমন্ডির সন্দেহজনক বাড়িতে এবং পুরান ঢাকার হিন্দু বাড়িতে তল্লাশী (গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে)।

২। সব ছাপাখানা বন্ধ করে দিতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজসমুহ, টিচার্স ট্রেনিং এবং ফিজিক্যাল ট্রেনিং ইনস্টিটিউট ও টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউটের সব সাইক্লোস্টাইল মেশিন জব্দ করতে হবে।

৩। সর্বাধিক কঠোরতায় কারফিউ জারি করতে হবে।

৪। অন্যান্য নেতাদের গ্রেফতার করতে হবে।

১২. সেনা বাহিনীর মধ্যে দায়িত্ব বন্টন-ব্রিগেড কমান্ডারগণ বিস্তারিত পরিকল্পনা প্রণয়ন করবেন কিন্তু নিম্মলিখিত বিষয়সমূহ অবশ্যই করতে হবে

(ক) সিগন্যাল ও অন্যান্য প্রশাসনিক ইউনিটসহ পূর্ব পাকিস্তানি ইউনিটসমূহের অস্ত্রাগার দখলে নিতে হবে। শুধুমাত্র পশ্চিম পাকিস্তানি সৈন্যদের হাতে অস্ত্র দিতে হবে।

ব্যাখ্যা : আমরা পূর্ব পাকিস্তানি সৈন্যদের বিব্রত করতে চাই না। আবার তাদের কাছে অপছন্দনীয় এমন কাজে তাদেরকে ব্যবহার করতেও চাই না।

(খ) পুলিশের থানাগুলোকে নিরস্ত্র করতে হবে।

(গ) পূর্ব পাকিস্তান রাইফেল্‌স-এর মহা পরিচালককে তার অস্ত্রাগারের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে।

(ঘ) আনসারদের সব রাইফেল নিয়ে নিতে হবে।

১৩. যে সমস্ত তথ্য প্রয়োজন-

(ক) নিম্নোক্তারা কে কোথায় আছেন

১। মুজিব	২। নজরুল ইসলাম
৩। তাজউদ্দিন	৪। ওসমানি
৫। সিরাজুল আলম	৬। মান্নান
৭। আতাউর রহমান	৮। প্রফেসর মোজাফ্ফর
৯। অলি আহাদ	১০। মিসেস মতিয়া চৌধুরী
১১। ব্যারিস্টার মওদুদ	১২। ফয়জুল হক
১৩। তোফায়েল	১৪। এন.এ. সিদ্দিকি
১৫। রউফ	১৬। মাখন এবং অন্যান্য ছাত্রনেতা

(খ) সমস্ত পুলিশ থানাসমূহের অবস্থান এবং তাদের রাইফেলের সংখ্যা।

(গ) শহরের শক্ত ঘাঁটি এবং অস্ত্র আছে এমন বাড়ির অবস্থান ও ঠিকানা।

(ঘ) ট্রেনিং ক্যাম্পের ঠিকানা।

(ঙ) যে সমস্ত সাংস্কৃতিক কেন্দ্র সামরিক ট্রেনিং কাজে ব্যবহার হচ্ছে সেগুলোর ঠিকানা।

(চ) বিদ্রোহীদের সক্রিয় সাহায্যদানকারি প্রাক্তন সামরিক বাহিনীর সদস্যদের নাম।

১৪. কমান্ড ও কন্ট্রোল- দুটো কমান্ড স্থাপন করা হবে :

(ক) ঢাকা এলাকা

কমান্ড- মেজর জেনারেল ফরমান

স্টাফ -ইস্টার্ন কমান্ড স্টাফ অথবা হেড কোয়ার্টার এম.এল.এ.

সৈন্য -ঢাকায় অবস্থানকারি।

(খ) প্রদেশের অন্যত্র

কমান্ড- মেজর জেনারেল কে.এইচ. রাজা

স্টাফ- হেডকোয়ার্টার ১৪ ডিভিশন

সৈন্য- ঢাকায় অবস্থানকারিরা ব্যতীত।

১৫. ক্যান্টনমেন্টের নিরাপত্তা

প্রথম পর্যায় : পি.এ.এফ.সহ সকলের অস্ত্র জমা নেওয়া।

১৬. যোগাযোগ

(ক) নিরাপত্তা।

(খ) নীল নক্সা।

সেনাবাহিনীর মধ্যে দায়িত্ব বন্টন

ঢাকা

কমান্ড ও কন্ট্রোল : মেজর জেনারেল ফরমান। হেড কোয়ার্টার ও এম. এল. এ. জোন 'বি'সহ।

সেনাবাহিনী:

হেড কোয়ার্টার- ঢাকায় অবস্থানরত ৫৭ ব্রিগেডের সেনা অর্থাৎ ১৮ পাঞ্জাব, ৩২ পাঞ্জাব (সি.ও. হিসেবে লে:কর্নেল তাজ দায়িত্ব নিবে), ২২ বালুচ, ১৩ ফ্রন্টিয়ার ফোর্স, ৩১ ফিল্ড রেজিমেন্ট, ১৩ হাল্কা এক-এক রেজিমেন্ট, এছাড়া কুমিল্লা থেকে কমান্ডো ৩ কোম্পানি।

করণীয় দায়িত্ব:

১। ২ এবং ১০ ইস্টবেঙ্গল রেজিমেন্ট, ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস (২৫০০) হেড কোয়ার্টার, রাজারবাগের রিজার্ভ পুলিশ (২০০০) দলকে নিরস্ত্র করা।

২। টেলিফোন এক্সচেঞ্জ এবং ট্রান্সমিটার, রেডিও, টেলিভিশন, স্টেট ব্যাংক দখল করা।

৩। আওয়ামী লীগের নেতাদের গ্রেফতার করা (বিস্তারিত তালিকা এবং ঠিকানা দেওয়া হবে)।

৪। ইউনিভার্সিটির হলসমুহ, ইকবাল, জগন্নাথ, লিয়াকত (প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়) দখল করা।

৫। সড়ক পথ, রেল পথ ও নৌ-পথে শহর অবরোধ করা, নদীতে টহলের ব্যবস্থা করা।

৬। গাজীপুরের কারখানাসমূহ এবং রাজেন্দ্রপুর সমরাস্ত্র কারখানার নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা।

পুনশ্চ: হেড কোয়ার্টার এবং ১৪ ডিভিশন মেজর জেনারেল খাদিম হোসেন রাজার অধীনে থাকবে।

যশোর

সেনাবাহিনী :

হেড কেয়ার্টার- ১০৭ ব্রিগেড, ২৫ বালুচ, ২৭ বালুচ, ২৪ এবং ৫৫ ফিল্ড রেজিমেন্ট।

করণীয় দায়িত্ব :

১। ১ম ইস্ট বেঙ্গল এবং ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলসএর আঞ্চলিক সদর দফতর এবং আনসারসহ রিজার্ভ পুলিশকে নিরস্ত্র করা।

২। যশোর শহরের নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করা এবং আওয়ামী লীগ ও ছাত্রনেতাদেরকে গ্রেফতার করা।
৩। এক্সচেঞ্জ ও টেলিযোগাযোগ দখল করা।
৪। যশোর ক্যান্টনমেন্ট, যশোর শহর, যশোর-খুলনা সড়ক পথ এবং বিমানবন্দর এলাকা ঘিরে নিরাপত্তা বেস্টনী তৈরী করা।
৫। কুষ্টিয়া টেলিফোন এক্সচেঞ্জ বিকল করে দেওয়া।
৬। প্রয়োজনবোধে খুলনার সেনা শক্তি বৃদ্ধি করা।

খুলনা

সেনাবাহিনী : ২২ এফ.এফ.
করণীয় কাজ :
১। শহরের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।
২। এক্সচেঞ্জ ও রেডিও ভবন দখল করা।
৩। উইং হেডকোয়ার্টার ই.পি.আর., রিজার্ভ কোম্পানী ও রিজার্ভ পুলিশকে নিরস্ত্র করা।
৪। আওয়ামী লীগ, ছাত্র ও কমিউনিস্ট নেতাদের গ্রেফতার করা।

রংপুর-সৈয়দপুর

সেনাবাহিনী : হেডকোয়ার্টার ২৩ ব্রিগেড, ২৯ ক্যাভালরী, ২৬ ফ্রন্টিয়ার ফোর্স ও ২৩ ফিল্ড রেজিমেন্ট।
করণীয় কাজ :
১। রংপুর-সৈয়দপুরের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।
২। সৈয়দপুরে ৩য় ইস্ট বেঙ্গলকে নিরস্ত্র করা।
৩। সম্ভব হলে দিনাজপুরে সেক্টর হেড কোয়ার্টার এবং রিজার্ভ কোম্পানী নিরস্ত্র করা অথবা সীমান্ত ফাঁড়িগুলোতে নতুন সৈন্য পাঠিয়ে তাদেরকে নিষ্ক্রিয় করা।
৪। রংপুরের রেডিও স্টেশন এবং টেলিফোন এক্সচেঞ্জ দখল করা।
৫। রংপুরের আওয়ামী লীগ এবং ছাত্র নেতাদেরকে গ্রেফতার করা।
৬। বগুড়া সমরাস্ত্র ডিপোর নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করা।

রাজশাহী

সেনাবাহিনী : ২৫ পাঞ্জাব।

করণীয় কাজ :

১। কমান্ডিং অফিসার হিসেবে শাফকাত বালুচকে পাঠানো।

২। রাজশাহী এক্সচেঞ্জ এবং রেডিও ভবন দখল করা।

৩। ইস্ট পাকিস্তান রাইফেল্‌স সেক্টর হেড কোয়ার্টার ও রিজার্ভ পুলিশ নিরস্ত্র করা।

৪। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় এবং বিশেষ করে মেডিকেল কলেজের নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করা।

৫। আওয়ামী লীগ নেতা ও ছাত্র নেতাদের গ্রেফতার করা।

কুমিল্লা

সেনাবাহিনী : ৫৩ ফিল্ড রেজিমেন্ট, ১১/২ মর্টার ব্যাটারি, স্টেশন ট্রুপ ও ৩ কমান্ডো ব্যাটালিয়ন (কোম্পানী ছাড়া)।

করণীয় কাজ:

১। ৪র্থ ইস্ট বেঙ্গল, ইস্ট পাকিস্তান রাইফেল্‌স-এর উইং হেড কোয়ার্টার ও জেলা রিজার্ভ পুলিশ নিরস্ত্র করা।

২। শহরের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা ও আওয়ামীলীগ এবং ছাত্র নেতাদেরকে গ্রেফতার করা।

৩। এক্সচেঞ্জসমূহ দখল করা।

সিলেট

সেনাবাহিনী:

কোম্পানী ছাড়া ৩১ পাঞ্জাব।

করনীয় কাজ:

১। রেডিও স্টেশন এবং এক্সচেঞ্জ দখল করা।

২। সুরমা নদীর কোয়েনো ব্রীজ দখল করা।

৩। বিমান বন্দর দখল করা।

৪। আওয়ামী লীগ ও ছাত্র নেতাদের গ্রেফতার করা।

৫। ইস্ট পাকিস্তান রাইফেল সেক্টর হেডকোয়ার্টার এবং রিজার্ভ পুলিশ নিরস্ত্র করা। সিকান্দারের সঙ্গে লিয়াজোঁ স্থাপন।

সেনাবাহিনী : ২০ বালুচ, সিলেটের ৩১ পাঞ্জাবের এক কোম্পানী। এছাড়া 'ডি-ডে'(আক্রমনের দিন) ০১টায় ইকবাল শাফির নেতৃত্বে কুমিল্লা থেকে ২৪ ফ্রন্টিয়ার ফোর্সের ১টি ভ্রাম্যমান কলাম যোগাযোগ সরঞ্জাম, ভারি অস্ত্র ও প্রকৌশলী ফিল্ড কোম্পানী নিয়ে সড়কপথে চট্টগ্রাম উপস্থিত হবে। আক্রমণের দিন সন্ধ্যায় এই কোম্পানী ফেনী এগিয়ে থাকবে।

করণীয় কাজ :

১। ই.বি.আর.সি, ৮ম ইস্ট বেঙ্গল সেকশন হেড কোয়ার্টার, ইস্ট পাকিস্তান রাইফেল্‌স ও রিজার্ভ পুলিশ বাহিনী নিরস্ত্র করা।

২। কেন্দ্রিয় পুলিশ অস্ত্রাগার (কুড়ি হাজার অস্ত্র) দখল করা।

৩। রেডিও স্টেশন এবং এক্সচেঞ্জ দখল করা।

৪। পাকিস্তান নৌ-বাহিনীর সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করা (কমোডর মমতাজ)।

৫। ৮ম ইস্ট বেঙ্গলের কমান্ডিং অফিসার ঝানঝুয়া এবং শাইগ্রীর সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করা। তাদেরকে বলা হয়েছে ইকবাল শাফি নাপৌছানো পর্যন্ত আপনার কাছ থেকে নির্দেশ গ্রহণের।

৬। যদি ঝানঝুয়া এবং শাইগ্রী তাদের কতৃত্ব সম্পর্কে আস্থাবান থাকে তাহলে নিরস্ত্র করার পয়োজন নেই। সেক্ষেত্রে ক্যান্টনমেন্ট থেকে শহরের সড়ক পথে এক কোম্পানীকে রক্ষণাত্মক অবস্থানে রেখে সড়ক অবরোধ দিবে। যাতে করে ই.বি.আর.সি. এবং ৮ম ইস্ট বেঙ্গল পরবর্তীতে তাদের আনুগত্য পরিবর্তন করলেও আটকা পড়ে।

৭। আমি সঙ্গে করে ব্রিগেডিয়ার মজুমদারকে নিয়ে যাচ্ছি। আক্রমণের দিন রাতেই ই.বি.আর.সি'র সি.আই. চৌধুরীকে গ্রেফতার করবে।

৮। উপরের দায়িত্ব পালনের পরে আওয়ামী লীগ ও ছাত্র নেতাদের গ্রেফতার করবে।

(১৯৭০ সালে ২১শে ফেব্রুয়ারি উপলক্ষে জগন্নাথ কলেজ ছাত্রলীগের পক্ষ থেকে বিলিকৃত প্রচারপত্র)

একুশের রক্ত স্বাধীনতার মন্ত্র

সংগ্রামী সাথীরা,

১৯৪৭ সালে ভারত বিভক্তির মধ্য দিয়ে যে, পাকিস্তান সৃষ্টি হয়। সে পাকিস্তানের সৃষ্টির পর থেকেই অবাঙালী পুঁজিপতি, সামন্তপ্রভু, আমলাতন্ত্র ও সামরিকচক্র শাসন ক্ষমতা কুক্ষীগত করে সমগ্র বাঙলা দেশ ও বাঙালিজাতির উপর উপনিবেশিক শোষন ও জাতিগত নিপীড়নের মাধ্যমে পৃথিবী থেকে বাঙালী জাতিকে নিঃচিহ্ন করে দেওয়ার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। এই উপ'নবেশিক শক্তি বাঙলাদেশকে চিরতরে গোলাম করে রাখার জন্য বাঙলা ভাষা ও সংস্কৃতির উপর হামলা করে কিন্তু মাতৃভাষাকে রক্ষা করার জনা ৫২ র একুশে ফেব্রুয়ারী বরকত সালাম রফিক জব্বার সহ শত শহীদের রক্তে সেদিন বাংলার ছাত্র শ্রমিক কৃষক মেহনতী মানুষ যে ইতিহাস রচনা করে। সে ইতিহাসের পথধরে বাংলার মানুষ যে একটানা সংগ্রাম করে আসছে। সে সংগ্রাম হচ্ছে ২৩ বছরের উপনিবেশিক শাসনের হাত থেকে বাংলা দেশ ও বাঙ্গালী জাতিকে মুক্ত করা। ৫২ র ২১শে ফেব্রুয়ারীর পর আজ ১৯ বছর অতিবাহীত হতে যাচ্ছে কিন্তু আজো জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে বাঙ্গলা ভাষা চালু হতে পারেনি। পুঁজিবাদী শোষনের ফলে বাঙ্গলার শ্রমিক কৃষক জনতা প্রতিদিনই সর্বহারায় পরিনত হয়ে যাচ্ছে কিন্তু কিছু সংখ্যক উঠতি বুর্জোয়া শ্রেনীর উদ্ভবের ফলে সমস্ত মেহনতী জনতার মুক্তি সংগ্রামে চলছে সুস্পষ্ট দ্বন্দ্ব। ফলে বিগত ৭ই ও ১৭ই ডিসেম্বরের নির্বাচনে বাংলার কৃষক শ্রমিক মেহনতী মানুষের সুস্পষ্ট রায়কে সুবিধাবাদের চোরা গলিতে ঠেলে দেওয়ার জন্য চলছে পায়তারা। তাই আজকে উপনিবেশিক বাঙ্গলা দেশের জনগনের সামনে উপস্থিত হয়েছে চরম অগ্নী পরীক্ষার সময় শত শহীদের রক্তে রঞ্জিত। ২১ শের সুমহান পতাকাকে উর্দ্ধে তুলে ধরে আজকে তাই বাঙ্গালীর স্বাধীনতার মহান আন্দোলনকে সর্বাধিনায়ক নেতাজী শেখ মজিবুর রহমানের নেতৃত্বে ঢেউর মত ছড়িয়ে দিতে হবে বাংলার প্রান্তে প্রান্তে। দুর্গ গড়তে হবে প্রতিটি ঘরে ঘরে এবং তার মাধ্যমেই সম্ভব ২১শে ফেব্রুয়ারীর শিক্ষা বাংলার কৃষক শ্রমিক মেহনতী মানুষের মুক্তি স্বদেশ পুঁজিবাদ উপনীবেশ বাদ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সমাজতান্ত্রিক বাংলা দেশ গঠন করা। এবারের ২১ শে ফেব্রুয়ারী হোক সমাজতান্ত্রিক বাংলা দেশ গঠনের রক্তেলাল শপথের দিন। জয় বাংলা।

একুশের কর্মসুচী :—

১৮ ই ফেব্রুয়ারী—কর্মী সভা (দিবা) ১—৩০ মিঃ কলেজ কেন্টিনের চার তালা।
১৯ শে ফেব্রুয়ারী—কর্মী সভা (নৈশ) সন্ধ্যা ৭ টায় কলেজ কেন্টিন
২০ শে ফেব্রুয়ারী—৫টায় কলেজে জমায়েত ও মশাল মিছিল।
২১ শে ফেব্রুয়ারী—সকাল ৪—৩০ মিঃ কলেজে জমায়েত, প্রভাতফেরী ও শহীদের মাজারে পুষ্প মাল্য অর্পন।

বিকেল ৩টায় জগন্নাথ কলেজে জমায়েত ও পল্টন ময়দানে জন সভায় মিছিল সহকারে যোগদান।

জগন্নাথ মহাবিদ্যালয়ের সর্ব্বস্তরে বাংলা ভাষা চালু কর।

কাজী জাহাঙ্গীর আমীর
সভাপতি

মোঃ সাইফুর রহমান
সাধারণ সম্পাদক

পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ
জগন্নাথ কলেজ শাখা।

পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ, জগন্নাথ কলেজ শাখার প্রচার সম্পাদক প্রচারিত। মাসুদুর রশীদ কর্তৃক প্রকাশিত ও প্রচারিত।

লেখক পরিচিতি

শেখ মোহাম্মদ জাহিদ হোসেন ১৯৫০ সালে গোপালগঞ্জ শহরের ভেন্নাবাড়ি গ্রামে এক মধ্যবিত্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। বাবার সরকারি চাকরির সুবাদে ছোটবেলা থেকেই তাঁর গ্রামের বাড়ির বাইরে কেটেছে। লেখাপড়া শুরু করেন ফরিদপুর মিশন হাই স্কুলে সেখানে ক্লাস ফোর পর্যন্ত পড়ার পর বাবার বদলির কারণে পরিবারের সঙ্গে চট্টগ্রাম চলে আসেন। প্রথমে গোসাইল ডাংগা আর. কে. মিশন হাই স্কুলে ভর্তি হন, সেখানে সেভেন পর্যন্ত পড়ার পর চট্টগ্রাম কলেজিয়েট স্কুলে ভর্তি হন এবং এই স্কুল থেকেই ১৯৬৬ সালে এস.এস.সি. পাস করার পর ঢাকা কলেজে ভর্তি হন। ঢাকা কলেজ থেকে আই.কম. ও বি.কম. পাস করার পর ১৯৭৪ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনস্টিটিউট অব বিজনেস এডমিনিস্ট্রেশন (আই.বি.এ.) থেকে এম.বি.এ. ডিগ্রি লাভ করেন। ১৯৬৮ সালে ঢাকা কলেজে বি.কম. পাঠরত অবস্থায় শুরু হয় তাঁর ঘটনাবহুল রাজনৈতিক জীবন। স্বচ্ছ রাজনৈতিক ধারণা, আদর্শ এবং বিশ্বাসের প্রতি অবিচল আস্থা, সর্বোপরি বন্ধুবাৎসল এই অক্লান্ত পরিশ্রমী কর্মী নিজ যোগ্যতায় অল্প দিনের মধ্যেই দলে নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে নেন। ঢাকা কলেজ ছাত্রলীগ শাখার সভাপতি পদ লাভ করেন ১৯৬৯ সালে। এরপর ১৯৭০ সালে প্রথমে ছাত্রলীগ কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ও পরে ঢাকা শহর ছাত্রলীগ শাখার সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় ভারতের দেরাদুন মিলিটারি একাডেমি থেকে বি.এল.এফ. বাহিনীর অধীনে প্রশিক্ষণ নিয়ে দেশে ফিরে গোপালগঞ্জে স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর ছাত্রলীগ বিভক্ত হলে তিনি পল্টন ময়দানে অনুষ্ঠিত (বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র পন্থী) ছাত্রলীগ সম্মেলনে কেন্দ্রীয় কমিটির সহ-সভাপতি পদে নির্বাচিত হন। পরবর্তীতে জাসদ গঠিত হলে এর গঠন প্রক্রিয়া নিয়ে হাই কমান্ডের সঙ্গে তাঁর মতবিরোধ ঘটে এবং এই বিরোধের কারণে তিনি সরাসরি রাজনীতি থেকে অবসর নেন।

১৯৪৮ সালের ৪ঠা জানুয়ারী পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ জন্ম লাভ করে। 'শিক্ষা, শান্তি, প্রগতি' এই তিন আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত হলেও দলের ভিতরকার মূল ভাবধারা ছিল বাঙালি জাতীয়তাবাদ। ১৯৫২-এর ভাষা আন্দোলন দিয়ে যাত্রা পথের শুরু। এরপরে সামরিক আইন বিরোধী আন্দোলন, '৬২-র শিক্ষা আন্দোলন, '৬৬ সালে স্বায়ত্তশাসনের দাবীতে ৬ দফা আন্দোলন, '৬৯-র গণআন্দোলন, '৭০-র নির্বাচন এবং '৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম-এই আন্দোলনগুলোতে ছাত্রলীগের কর্মীরা শুধু অগ্রণী ভূমিকাই পালন করেনি, প্রতিটি আন্দোলনের চালিকা শক্তি হিসেবে কাজ করেছে ছাত্রলীগ।

শোষণ, অত্যাচার আর বঞ্চনার বিরুদ্ধে ছাত্রলীগের সঠিক, বলিষ্ঠ এবং নির্ভীক নেতৃত্ব তাঁদেরকে পৌঁছে দিয়েছে জনগণের কাছে, করেছে জনগণের আপন। '৬৯-এর ছাত্র আন্দোলনে জনগণের সম্পৃক্ততা, আশা-আকাঙ্খা, সচেতনতা তাঁদেরকে আরও দুঃসাহসী করে তুলেছে। জনগণের মুক্তির আকাঙ্খার সাথে তাল মিলিয়ে ছাত্রলীগের কর্মীরা রাজপথে গর্জে উঠেছে-"বীর বাঙালী অস্ত্র ধর-বাংলাদেশ স্বাধীন করো"।

এক এক করে পতাকা, জাতীয় সঙ্গীত, স্বাধীনতার ইশতেহার সবই জাতিকে উপহার দিয়েছে ছাত্রলীগ। এমনকি স্বাধীনতা যুদ্ধে সম্পূর্ণ নিজেদের প্রচেষ্টা এবং নেতৃত্বে গঠন করেছে 'বাংলাদেশ লিবারেশন ফোর্স' (যা সাধারণভাবে 'মুজিববাহিনী নামে পরিচিত ছিল)। সংক্ষিপ্ত সময়ের প্রস্তুতি ও প্রশিক্ষণ নিয়ে ছাত্রলীগের ত্যাগী কর্মীরা অসীম মনোবল সহকারে জনগণের পাশে দাঁড়িয়ে লড়াই করেছে দুর্ধর্ষ পাকিস্তানী সামরিক বাহিনীর বিরুদ্ধে।

১৯৬৯ থেকে ১৯৭১-এর অগ্নিঝরা সেইসব দিনগুলোর টুকরো টুকরো স্মরণীয় ঘটনা নিয়ে রচিত হয়েছে এই বই।